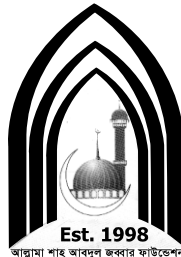


الحديث، الفقه، الاجتهاد والتقليد

# হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে  
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ আল-আমীন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: রবিউল আউওয়াল ১৪৩৬ হি. = জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১১১, বিষয় ক্রমিক: ০২

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফা মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁ থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

---

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: [mujahid\\_sach@yahoo.com](mailto:mujahid_sach@yahoo.com)

---

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজুদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

---

মূল্য : ২৫০ [দুইশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

---

**Hadis Fiqh Ijtihad O Taqleed, By: Mohammad Abdul Hai Nadvi,**  
Publication By: Shah Abdul Jabbar AS-Sharaf Academy, Chittagong,  
Bangladesh. Price: 250

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[sajbd@yahoo.com](mailto:sajbd@yahoo.com)

[www.sajbd.org](http://www.sajbd.org)

## সূচিপত্র

### আমাদের কথা

০৬

### হাদীস শরীফ গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্তর ও পরিচিতি

০৯

প্রথম স্তর

০৯

দ্বিতীয় স্তর

১৬

তৃতীয় স্তর

১৮

চতুর্থ স্তর

২০

পঞ্চম স্তর

২১

হাদীসশাস্ত্রে অধিক গ্রন্থ প্রণেতাদের প্রসঙ্গ

২১

বর্ণনাকারীগণের (রাবী) স্তরসমূহ

২৪

হাদীস শরীফ শিক্ষালাভের পদ্ধতিসমূহ

১৭

হাদীস বিশুদ্ধ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার মূলনীতি

২৯

• প্রথম মূলনীতি

২৯

• দ্বিতীয় মূলনীতি

৩০

• তৃতীয় মূলনীতি

৩০

• চতুর্থ মূলনীতি

৩২

• পঞ্চম মূলনীতি

৩২

• ষষ্ঠ মূলনীতি

৩২

• সপ্তম মূলনীতি

৩৩

• অষ্টম মূলনীতি

৩৪

• নবম মূলনীতি

৩৫

### ফিকহ পরিচিতি

৩৬

ইলমুল ফিকহের সংজ্ঞা

৩৬

ফিকহের আলোচ্য বিষয়	৩৮
ফিকহের উদ্দেশ্য	৩৮
ফিকহের গুরুত্ব	৩৮
ফিকহ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	৩৯
ফিকহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা	৪০
ফিকহশাস্ত্রের বিস্তার	৪১
ফিকহের ক্রমবিকাশ	৪১
• প্রথম বা প্রাচীন যুগ (হিজরী ১৩০-৪০০)	৪১
• দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগ (হিজরী ৪০০-৭০০)	৪২
• তৃতীয় যুগ (হিজরী ৭৫০-আজ অবধি)	৪৩
• প্রথম যুগে ফিকহী মাসায়েল সম্পাদনার পদ্ধতি	৪৪
তবাকাতুল ফুকাহা (ফকীহদের স্তর)	৪৬
• প্রথম স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الدِّينِ	৪৬
• দ্বিতীয় স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الْمَذَاهِبِ	৪৬
• তৃতীয় স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الْمَسَائِلِ	৪৬
• চতুর্থ স্তর	৪৭
• পঞ্চম স্তর	৪৭
• ষষ্ঠ স্তর	৪৭
• সপ্তম স্তর	৪৮
মায়হাবসমূহ	৪৮
ফিকহশাস্ত্র পরিচিতি	৪৯
• ফিকহশাস্ত্রের সংজ্ঞা	৪৯
• ফিকহশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়	৫১
• ফিকহশাস্ত্রের উদ্দেশ্য	৫১
• ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি	৫২
• ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থাবলি	৫৩
• ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ	৫৩
আসহাবুল হাদীস ও আসহাবুর রায়	৫৬
• ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কুফা এবং ইলমে হাদীস	৫৯
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু</small> <small>আলায়হি</small> ও ইলমে হাদীস	৬১

• হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small>	৬৪
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small> -এর তাবয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ	৬৯
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small> -এর জ্যেষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলী	৭১
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small> -এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শিষ্যবৃন্দ	৭২
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small> -এর কিতাবুল আসার	৭৫
• ইমাম আবু হানিফা <small>রহমতুল্লাহু আলায়হি</small> -এর ওপর আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা	৮০
ইমামদের তাকলীদ বা অনুসরণ প্রসঙ্গ	৯১
• তাকলীদে সংজ্ঞা	৯২
• ইমামের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা	৯৭
• কুরআনের আলোকে তাকলীদ	১০০
• হাদীসের আলোকে তাকলীদ	১০৩
• সাহাবা যুগে তাকলীদ	১০৪
• সাহাবা যুগে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ	১০৬
• তাকলীদে স্তর	১১০
১. জনসাধারণের তাকলীদ	১১০
২. গভীর জ্ঞানী আলেমের তাকলীদ	১১০
৩. মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ	১১১
৪. মুজতাহিদে মুতলাকের তাকলীদ	১১১
মাযহাব চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১২
১. হানাফী মাযহাব	১১২
২. মালিকী মাযহাব	১১৭
৩. শাফিয়ী মাযহাব	১১৯
৪. হাম্বলী মাযহাব	১২২
গ্রন্থপঞ্জি	১২৬

## আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাঁর পথপ্রদর্শনের জন্য নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। হাদীসে নববী তথা সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআনে মানব-জীবনের যে রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে মহানবী ﷺ তাঁরই উত্তম নমুনা।

মানবজীবনে হাদীসের জ্ঞানের আবশ্যকতা, হাদীসের বিভিন্ন পর্যায়, হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন ধরণ ও স্তর, প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি (হাদীস চর্চাকারীদের বিভিন্ন স্তর), হাদীসশাস্ত্রবিদদের মায়হাবভিত্তিক পরিচিতি ও তাঁদের অনুসরণের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় সহজবোধ্য করে এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বসাধারণের মাঝে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করে পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা এ গ্রন্থে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করেছি। আর তা হলো ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রের জ্ঞান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের নিয়ম-নীতি, বৈধ পদ্ধতি উপস্থাপন করাই এ শাস্ত্রের উপজীব্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সামগ্রিক জীবন আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইসলামেই সে সর্বাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে।

মহানবী ﷺ-এর ওয়াফাতের পর ইসলাম বিজয়ী বেশে আরবের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের সারিতে যুক্ত হয় নানা ধর্মের, বর্ণের ভিন্ন ভৌগোলিক আবহ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ অনারব। ফলে ইসলামী আইনের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় ইজমা ও কিয়াস নামে আরও দুটি উৎস। জনগণের জীবন-ব্যবস্থার স্বার্থে ইসলামী আইন তথা ফিকহের সম্পাদনা ও সংকলনের প্রয়োজন দেখা দিলে তথা বিধি-বিধান হাতে কলমে শুরু হয়। আর সে যুগেই এর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এ মহৎ কাজে যিনি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন তিনি হলেন ইমাম আযম নু'মান

ইবনে সাবিত আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহি। এর নামকরণ করা হয় ফিকহে ইসলামী তথা ইসলামী আইন। তখন থেকে আজ অবধি এর কাজ অব্যাহত রয়েছে। আমরা তার পরিচিতি, সম্পাদনা ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তার ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করছি।

ইজতিহাদ অর্থ কোনো কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন প্রয়াস। পরিভাষায় ইসলামী শরীয়তের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা হয়। ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। যিনি ইজতিহাদ করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয়। যে ব্যক্তি বিচার-বিবেচনায় মত ও পথ মেনে নেয় তাকে মুকাল্লিদ বলা হয়।

তাকলীদ ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে সর্বজন মান্য ইমামগণ কর্তৃক শরীয়ত নির্দেশিত জীবনপ্রণালীর সমষ্টি। এটা হলো কোনো কারণ-সন্ধান ব্যতিরেকেই অপর কারো বক্তব্য বা কর্মকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিশ্বাসপূর্বক গ্রহণ করা। তাকলীদের ঐতিহাসিক সূচনা ধর্মীয় আইনগত মাযাহিবের উৎপত্তির সঙ্গেই হয়েছে যা আংশিক বা বিশেষভাবে খ্যাতিমান ফিকহশাস্ত্রের ইমামগণের প্রতি দৃঢ় আনুগত্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়। পরবর্তীতে এটি হাদীসসমূহের পর্যালোচনা বা ফিকহের মাসআলাসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন। মুজতাহিদ তথা উৎসসমূহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ আইনসমূহ গঠনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বীকার করে সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠন হওয়ায় সকল প্রকার ইজতিহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন থেকে পরবর্তী বিজ্ঞ আলিমগণ ও সাধারণ জনগণের জন্য পূর্বতন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের তাকলীদ বা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

সার্বিকভাবে প্রচলিত মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে এবং বহু শতাব্দী যাবৎ সকলেই তাদের পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রণীত কর্তৃপক্ষীয় অনুশাসন অনুকরণ করতে থাকে। অতএব কেউ ফিকহশাস্ত্রের ক্ষেত্রের পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের দ্বারা প্রদত্ত বিধান হতে স্বতন্ত্র তাঁর নিজস্ব কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা রায় প্রদানে নিজেকে যোগ্যতাসম্পন্নরূপে বিবেচনা করতেন না। কালের ক্রমাবর্তনে পরবর্তী সকল ব্যক্তি মুকাল্লিদ অর্থাৎ তারা তাকলীদ পালন করেন। তাদের আস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কেবল ইসলামের প্রাথমিক শতকের ফকীহগণের মধ্যেই মূল উৎস থেকে ফিকহী সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত গভীর জ্ঞান এবং প্রকৃত প্রজ্ঞা বর্তমান ছিল, যা পরবর্তীদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এ গ্রন্থে পবিত্র হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইজতিহাদ ও তাকলীদ করা বা না করার ওপর আলোচনা করেছি। উল্লিখিত বিষয়ের ওপর বর্তমানে ১৪ শত বছর পর যদি বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় তাহলে সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বৃদ্ধি পাবে। এতে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ দিনদিন নতুন রূপ ধারণ করবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

আমাদের প্রয়াস দ্বারা কারো যদি উপকার হয় তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সতর্ক আলোচনা ও নিরলস প্রচেষ্টার পরও যদি তথ্যগত বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা আমাদেরকে জানালে পরিশুদ্ধ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহান আল্লাহ সকলকে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

০১ জানুয়ারি ২০১৫  
চট্টগ্রাম

আরজগুজার  
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



## হাদীস শরীফ গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্তর ও পরিচিতি

হাদীসের কোন কিতাবটি বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন পর্যায়ে পড়ে, হাদীস শিক্ষার্থীদের জন্য এটা জানা আবশ্যিক। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয রাহমতুল্লাহু আলায়হ জনৈক শিষ্যকে এক চিঠি লিখেন, যা এক পুস্তিকার পর্যায়ে পড়ে। পুস্তিকাটির নাম ছিলো *মা যাজিবু হিফযুহ লিন-নাযির*। এতে তিনি হাদীস গ্রন্থাবলিকে ৫টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আমরা এখানে সে ৫টি স্তর সম্পর্কে কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করছি।

### প্রথম স্তর

প্রথম স্তরে হচ্ছে সে সব হাদীস গ্রন্থ, যেগুলোর সংকলকগণ আবশ্যিক করে নিয়েছেন যে, তাঁদের কিতাবে গৃহীত সকল হাদীস সহীহ হাদীসের সকল শর্তের বিচারে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হবে। এ ধরনের কিতাবগুলোকে সিহাহ মুজাররাদা বলে। সূতরাং এ শ্রেণীর কিতাবসমূহের প্রতিটি হাদীসের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে, সে সব গ্রন্থে গৃহীত হাদীসসমূহ তাদের গ্রন্থকারের নিকট সহীহ। নিম্নে প্রদত্ত কিতাবগুলোকে এ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা— ১. সহীহ আল-বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, ৪. মুসতাদরাকে হাকিম, ৫. সহীহ ইবনে হিব্বান, ৬. সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৭. আবদুল্লাহ ইবনে ইবনুল জারুদ রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর আল-মুনতাকা, ৮. কাসিম ইবনে আসবাগ রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর আল-মুনতাকা, ৯. যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর আল-মুখতারাহ, ১০. সহীহ ইবনুস সাকান, ১১. সহীহ ইবনুল আওয়ানা।

এসব গ্রন্থকে এদিক থেকে সিহাহ মুজাররাদা (নিখাদ বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি) শ্রেণীতে গণনা করা হয় যে, এগুলো সংকলকগণ শুধু সেসব হাদীসই গ্রহণ করেছেন, যা তাঁদের নিজ ধারণায় বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেগুলো বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি নয়। সহীহাইন (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ও ইমাম মালিক রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর মুওয়াত্তার ব্যাপারে সবাই একমত যে, এসব গ্রন্থের সকল হাদীস

বাস্তবে বিশুদ্ধ। শুধু ইমাম দারাকুতনী رحمۃ اللہ علیہ এতে মতানৈক্য পোষণ করেন। তিনি নিরীক্ষণ করত তাঁর আত-তা'তাবুউ আল্লাস সহীহাইন গ্রন্থে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অনেক হাদীসকে গায়রে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম হাফিয ইবনুল হাজার আসকলানী رحمۃ اللہ علیہ তাঁর হাদিউস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী নামক কিতাবে সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে ইমাম দারাকুতনী رحمۃ اللہ علیہ-এর যাবতীয় সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেছেন। যার দরুন তাঁর পরবর্তী কালের সকল আলেম বুখারী-মুসলিমের প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর একমত পোষণ করেন।

### প্রথম কিতাব: মুসতাদরাকে হাকিম

মুসতাদরাকে হাকিম। ইমাম হাকিম رحمۃ اللہ علیہ কর্তৃক সংকলিত মুসতাদরাক গ্রন্থের ব্যাপারে বলা যায়, উক্ত গ্রন্থটি বাস্তবে নিখাদ বিশুদ্ধ গ্রন্থ নয়। তাই প্রায় সকল আহলে ইলম এ বিষয়ে একমত যে, প্রকৃতপক্ষে মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থখানি হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইমাম হাকিম رحمۃ اللہ علیہ হাদীসের বিশুদ্ধায়নের ব্যাপারে অত্যধিক অমনোযোগী। তিনি শুধু যঈফ ও মুনকার হাদীস নয়, বরং কখনও কোন কোন মওযু হাদীসকেও সহীহ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থখানাকে শুধু এ কারণে প্রথম স্তরের মধ্যে গণ্য করা যায় যে, গ্রন্থটির গ্রন্থকার নিজ ধারণানুযায়ী সকল হাদীস বুখারী অথবা মুসলিমের শর্তাবলি অনুযায়ী সহীহ হাদীস হিসেবে সংকলন করেছেন। যদিও তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টায় চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারেননি। তাইতো ইমাম হাকিম رحمۃ اللہ علیہ-এর অমনোযোগিতা এতই বিখ্যাত ও পরিচিত যে, আবু সাঈদ আল-মালীনী رحمۃ اللہ علیہ একথা বলে দিয়েছেন, মুসতাদরাক কিতাবে সহীহ হাদীস বলতে একটিও নেই।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এতে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। যেমন—ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمۃ اللہ علیہ যিনি হাকিম رحمۃ اللہ علیہ-এর সবচেয়ে বড় সমালোচক, ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী رحمۃ اللہ علیہ তাদরীবুর রাবী নামক পুস্তকে তাঁর এ উক্তিটি লিপিবদ্ধ করেছেন, মুসতাদরাকে হাকিমের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ হাদীস নিঃসন্দেহে বুখারী অথবা মুসলিমের শর্তাবলির ওপর পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ এবং এক চতুর্থাংশ হাদীস তো এরূপ, যেগুলোর বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন প্রামাণ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো একটি দুর্বল দিক রয়েছে। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা ২০০ অথবা তারও কিছু ওপরে। এগুলোর ওপর আমল সমীচীন নয়। অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ অত্যন্ত দুর্বল, মুনকার ও মওযু হাদীস সংবলিত। ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمۃ اللہ علیہ মুসতাদরাক গ্রন্থের সাথে মুদ্রিত এ গ্রন্থের تَلْخِصٌ (সারসংক্ষেপ) নামক পুস্তিকায় প্রতিটি হাদীসের ওপর পৃথক পৃথক পর্যালোচনা করেছেন।

## ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর অমনোযোগিতার কারণ

আলেম সমাজে এ বিষয়ে সমালোচনা চলেছে যে, ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি হাদীসের হাফিয হওয়া সত্ত্বেও কেন মুস্তাদরাক গ্রন্থ সংকলনে তাঁর দ্বারা অমনোযোগিতা প্রকাশ পেল। এর বহুবিধ কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন মনীষী তাঁর ওপর শিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ আরোপ করেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেউ কেউ বলেন, রাফেযী মতাবলম্বীদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর অনেক হাদীসের দুর্বলতা তাঁর অনুভব হয়নি। কিন্তু এ প্রশ্নটির সর্বাধিক উত্তম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর ইমাম হাফিয জামালুদ্দীন যায়লায়ী রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত নসবুর রায়াহ গ্রন্থে নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম পড়া প্রসঙ্গে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর অমনোযোগিতার কারণ একাধিক। যথা—

১. ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর অমনোযোগিতার প্রথম কারণ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি কোন কোন সময় **مُكَلَّمٌ** (বিতর্কিত) বর্ণনাকারীর বর্ণনাও উদ্ধৃত করে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক তখনই, যখন সংশ্লিষ্ট হাদীসের সহায়ক **الْمُتَابِعُ** (মুতাবি') ও **الشَّوَاهِدُ** (শাওয়াহিদ) জাতীয় হাদীস বিদ্যমান থাকে। যেমন— আবু ওয়াইস একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী, কিন্তু ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি তার থেকে বর্ণিত হাদীস: **«فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِیْ نَضْفِیْنِ»** **فَنَضَفْتُهَا لِیْ وَنَضَفْتُهَا لِعَبْدِیْ** উদ্ধৃত করেছেন।<sup>১</sup>

তার কারণ এ হাদীসটি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলায়হি, শু'বা রহমতুল্লাহি আলায়হি ও ইবনে উয়াইনাহ রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মতো অপরাপর শক্তিশালী বর্ণনাকারীদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের জায়গায় ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি এটাই দেখেন, আবু ওয়াইস ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর বর্ণনাকারী। সে জন্যে তিনি আবু ওয়াইসের সেসব হাদীস উদ্ধৃত করেন, যেগুলোর মুতাবি' তথা অনুযায়ী কোন হাদীস বিদ্যমান নেই। তা সত্ত্বেও তিনি একথা বলে দেন, **هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ** (এটি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর শর্তানুযায়ী সহীহ)।

২. অনেক সময় এরূপ হয় যে, একজন বর্ণনাকারীর হাদীসগুলো একজন শায়খ থেকে শক্তিশালী সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত, কিন্তু অপর শায়খ থেকে শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এ অবস্থায় ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সেই হাদীসগুলোই গ্রহণ করেন, যা প্রথম শায়খ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— বুখারী রহমতুল্লাহি আলায়হি ও মুসলিম রহমতুল্লাহি আলায়হি খালেদ ইবনে মুখাল্লাদ আল-কুতওয়ানীর সেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সুলাইমান ইবনে বিলাল থেকে

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৭, হাদীস : ৪০ [৩৯৫]; হযরত আবু হুরায়রা রাযীল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

বর্ণিত হয়েছে। অথচ ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি শুধু খালেদ ইবনে বিলাল রাহমাতুল্লাহি-এর নামটাই দেখলেন এবং তাঁকে شَيْخَيْنِ (দুই প্রবীণ)-এর বর্ণনাকারী মনে করে তাঁর প্রতিটি হাদীসকে عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (দুই শাইখের শর্তানুযায়ী সহীহ) বলে দিলেন। অথচ অপর শায়খদের কাছ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর বর্ণনা দেননি। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন বর্ণনায় خَالِدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ সূত্রটি দেখে মনে করেন, খালিদ ও আবদুল্লাহ উভয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি-এর নির্বাচিত শর্তানুযায়ী সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। তাহলে এটা মনে করাটাই হবে ভুল। কেননা আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্না থেকে গৃহীত খালিদ ইবনে মুখাল্লাদির হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি-এর অমনোযোগিতার তৃতীয় কারণ কখনো একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলো এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, কিন্তু সে সময় অতিক্রান্ত হলে পরে তাঁর বর্ণনাসমূহ দুর্বল ও الْمَرْدُودُ (প্রত্যাখ্যাত) বলে গণ্য হয়। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি এরূপ স্থলে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন যে, এরূপ বর্ণনাকারীর শুধু প্রথম যুগের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে। যেমন- মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রসঙ্গে রিজাল হাদীসশাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কেরামের বিতর্ক বিখ্যাত হয়ে আছে, কিন্তু তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তাঁর সে বর্ণনাগুলোই গ্রহণ করেছেন যা তিনি গভর্নর হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। এখন যদি কেউ শুধু মারওয়ান ইবনুল হাকামের নাম দেখে এ মনে করে বসে যে, ইনি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি-এর বর্ণনাকারী। অতএব তাঁর বর্ণিত হাদীসও সহীহ, তাহলে এটা হবে ভুল। ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি এরূপ নানা বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

৪. কোন কোন সময় ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি কোন দুর্বল বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করে দেন। যেমন- ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আবদুল্লাহ ইবনু লাহীআকে আমর ইবনুল হারিসের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। عَنْ عُمَرَو بْنِ الْحَارِثِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ لَ هِيعَةَ অর্থাৎ এভাবে মিলিয়ে উল্লেখ করার অর্থ আবদুল্লাহ ইবনু লাহীআর বিশ্বস্ততা বর্ণনা করা নয়, বরং মূলত তিনি আমর ইবনুল হারিসের ওপর বর্ণনার ভিত্তি স্থাপন করে আবদুল্লাহ ইবনে লাহীআহকে তার পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। এখন কেউ যদি এর ওপর ভিত্তি স্থাপন করে ইবনে লাহীআহকে ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী বলে

আখ্যায়িত করে তাঁর বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস ‘মুসলিমের শর্তে সহীহ’ বলে দেন, তাহলে এটা হবে একেবারে গাফলতি।

৫. তিনি কোন বর্ণনাকারীকে দেখেন সে বুখারীর বর্ণনাকারী, আর কাউকে দেখেন যে সে মুসলিমের বর্ণনাকারী। এ জন্যে তিনি উক্ত সনদকে **صَحِيحٌ عَلَىٰ** **شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ** তথা বুখারী মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে ‘বিশুদ্ধ-হাদীস’ বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ তাঁর এ আখ্যায়িতকরণ যথাযথ নয়।

৬. ইমাম হাকিম **رحمتهما** **আলায়াহ**-এর অমনোযোগিতার আর একটি কারণ এই যে, তিনি কখনো কখনো একটি সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীকে দেখলেন, তারা বুখারী-মুসলিমের বর্ণনাকারী। কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে কোন একজন বা দু’জন বর্ণনাকারী দুর্বল। এদের একজন বা দু’জন বর্ণনাকারীর দুর্বলতার দিকে তাঁর দৃষ্টি হত না।

আল্লামা ইমাম কুতানী আল-মাগরিবী **رحمتهما** **আলায়াহ** আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফার মধ্যে ইমাম হাকিম **رحمتهما** **আলায়াহ**-এর অমনোযোগিতার একটি সঙ্গত কারণও বর্ণনা করেছেন। সেটা হচ্ছে, ইমাম হাকিম **رحمتهما** **আলায়াহ**-এর মুস্তাদরাক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার পর দ্বিতীয় বার নিরীক্ষণের সুযোগ পাননি। পাণ্ডুলিপি শুদ্ধায়ন ও পরিমার্জনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ জন্যেই কিতাবের প্রথম পঞ্চমাংশ যা তিনি দ্বিতীয় বার নিরীক্ষা করতে পেরেছেন, সেখানে অমনোযোগিতার প্রতিফলন নিতান্ত কম।

উল্লিখিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম হাকিম **رحمتهما** **আলায়াহ**-কে হাদীস বিশুদ্ধায়নের ব্যাপারে অত্যন্ত শৈথিল্যপরায়ণ মনে করা হয়। এরই ভিত্তিতে ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী **رحمتهما** **আলায়াহ** তালখীসুল মুসতাদরাক নামক কিতাবে কোন কোন জায়গায় তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

### দ্বিতীয় কিতাব: সহীহ ইবনে হিব্বান

সহীহ ইবনে হিব্বান। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, মুসতাদরাকে হাকিমের মতো এ কিতাবটি বিশুদ্ধতার পর্যায়ে পৌঁছেনি। কেননা ইবনে হিব্বান **رحمتهما** **আলায়াহ** ও বিশুদ্ধায়নের ব্যাপারে ইমাম হাকিম **رحمتهما** **আলায়াহ**-এর মতো অমনোযোগী ছিলেন। কিন্তু ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী **رحمتهما** **আলায়াহ** তাদরীবুর রাবী গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সহীহ ইবনে হিব্বান এ দিক থেকে মুসতাদরাকের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে, তিনি যেসব শর্ত নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো পুরোপুরি পালন করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, বিশুদ্ধায়নের ব্যাপারে ইবনে হিব্বানের শর্তাবলি অপর মুহাদিসীনের তুলনায় শিথিল। এর কারণ দুটো। যথা—

১. ইবনে হিব্বান আলায়াহ হাসান জাতীয় হাদীসগুলোকেও সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর নিকট হাসান হাদীস কোন ভিন্ন প্রকার নয়। বরং সহীহের প্রকার বিশেষ। সুতরাং তিনি তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা অন্য মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহের স্তরে উত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু ইবনে হিব্বান আলায়াহ হাসান হওয়ার ভিত্তিতে সেগুলোকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
২. ইবনে হিব্বান আলায়াহ-এর মতে, যদি একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর শিক্ষক ও ছাত্র পরিচিত এবং বিশ্বস্ত হন, তাহলে তার অজ্ঞাত হওয়া ক্ষতিকর নয়, বরং এ অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস তাঁর মতে সহীহ অথচ অন্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীর অজ্ঞাত হওয়ার কারণে সে হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে হিব্বানের এ নীতি তাঁর *কিতাবুস সিকাত* গ্রন্থেও প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা তাঁর নিকট বিশ্বস্ত এর সংজ্ঞা হচ্ছে, যে বর্ণনাকারীর কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি, তিনিই বিশ্বস্ত। সুতরাং তিনি অনেক অজ্ঞাত বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্তদের তালিকায় গণ্য করে নিয়েছেন। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ নিছক এর ওপর ভিত্তি করে কোন বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা অনুমোদন করেন না যে, ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্তদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যে পর্যন্ত তার ‘অজ্ঞাত না’ হওয়াটা প্রমাণিত হবে।

সহীহ ইবনে হিব্বান এদিক থেকে তো নিঃসন্দেহে মুসতাদরাকের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে, ইবনে হিব্বান আলায়াহ নিজ শর্তাবলি পালন করেছেন। কিন্তু এসব শর্ত এত শিথিল যে, হাসান হাদীস এমনকি দুর্বল হাদীসও সহীহের সংজ্ঞায় এসে পড়ে। এজন্যে এ গ্রন্থটি যদিও মুসতাদরাকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু অপরাপর সহীহ গ্রন্থাবলির ওপর স্থান লাভ করেনি।

### তৃতীয় কিতাব: সহীহ ইবনে খুযায়মা

সহীহ ইবনে খুযায়মা বিশুদ্ধতার দিক থেকে এ গ্রন্থকে সহীহ ইবনে হিব্বানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। তবুও ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়া আলায়াহ *ফাতহুল মুগীস* কিতাবে লিখেন, সহীহ ইবনে খুযায়মার সকল হাদীস সহীহ নয়, বরং কোন কোন দুর্বল হাদীসও এতে স্থান পেয়েছে। যেমন- এতে একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ﴾ [الأعلى]، فَقَالَ: «أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ».

‘কসীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর

দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾** -কে আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘এটি সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।’<sup>১</sup>

কিন্তু ইমাম হাফিয় মুনিযিরী رحمتهما আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে এ হাদীসটি সহীহ ইবনে খুযায়মার সূত্রে উদ্ধৃত করার পর বলেন,

**كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاهٌ.**

‘কসীর ইবনে আবদুল্লাহ কল্পনা বিলাসী।’<sup>২</sup>

ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়া رحمتهما এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো সহীহ ইবনে খুযায়মাকে **صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ** (নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধ) আখ্যায়িত করা স্বয়ং সংকলনের ধারণারই বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু বাস্তবে তার অনেক হাদীস দুর্বল।

হাফিয় ইবনে ফাহাদ মালিকী رحمتهما লুহযুল লিহায় ফী তাবাকাতিল হুফফায় গ্রন্থে হাফিয় ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمتهما-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, সহীহ ইবনে খুযায়মার তিন চতুর্থাংশ ইমাম হাফিয় ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمتهما-এর সময়কালের পূর্বেই দুস্পাপ্যে পরিণত হয়েছিল। শুধু এক চতুর্থাংশ পাওয়া যেত।<sup>৩</sup>

হাফিয় শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়া رحمتهما ফাতহুল মুগীস গ্রন্থে লিখেন, এ চতুর্থাংশও আমাদের কালে অত্যন্ত দুস্পাপ্য।

## চতুর্থ কিতাব

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনুল জারুদ رحمتهما-এর **الْمُسْتَقْبَلُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي** গ্রন্থে এটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর সংকলন। এর অধিকাংশ হাদীস বিশুদ্ধ। তবে হাতে গোনা কতিপয় হাদীসের সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে।

## পঞ্চম কিতাব

প্রায় অনুরূপ অবস্থা কাসেম ইবনে আসবাগ رحمتهما সংকলিত **আল-মুনতাকা** গ্রন্থটির। কাসিম ইবনে আসবাগ رحمتهما-এর **আল-মুনতাকা** আমাদের আলোচিত পঞ্চম গ্রন্থ।

<sup>১</sup> ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৯০, হাদীস : ২৪২০

<sup>২</sup> আল-মুনিযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, খ. ২, পৃ. ৯৭, হাদীস : ১৬৫৪

<sup>৩</sup> ইবনে ফাহাদ, *লাহযুল আলহায় বি-যায়লি তাবাকাতিল হুফফায়*, পৃ. ২১৩

## ষষ্ঠ কিতাব

ইমাম যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী رحمہ اللہ -এর **الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ أَوْ أَلْ مُسْتَخْرَجُ**

এই গ্রন্থটি। এটি হিজরী সপ্তম শতাব্দীর সংকলন। এটি আরবী বর্ণমালা অনুসারে সাহাবীদের অনুক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত বিশাল গ্রন্থ। কিন্তু বাস্তবে একেও নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধ বলা কঠিন। কেননা এতে এমন কতিপয় হাদীস স্থান পেয়েছে যেগুলো বিশুদ্ধ নয়। যদিও তার সংখ্যা নিতান্ত কম।

## সপ্তম কিতাব

সহীহ ইবনে সাকন এ গ্রন্থটি যেহেতু দীর্ঘকাল যাবত দুঃপ্রাপ্য, এজন্যে এর ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা কঠিন।

উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো, প্রথম স্তরের কিতাবগুলোর মধ্যে শুধু সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমই এমন, যা বাস্তবতার আলোকে নিরঙ্কুশ সহীহ। সুতরাং যে হাদীস এ গ্রন্থ দুটোতে পরিলক্ষিত হবে, তা নির্দিধায় সহীহ বলা যেতে পারে। অপর কোন গ্রন্থ এ পর্যায়ের নয়। তবে অপর গ্রন্থগুলো সম্পর্কে এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, সেগুলোর সংকলকদের কাছে তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলো সহীহ তথা বিশুদ্ধ। অনেক সময় হাদীস বিশুদ্ধ ও দুর্বল আখ্যায়িতকরণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় সেসব মনীষীর বিশুদ্ধ আখ্যায়িতকরণ বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

## দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে সেসব গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর সংকলকগণ বিশেষ নীতি অবলম্বন করেছেন যে, তাদের গ্রন্থে হাসান জাতীয় হাদীসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন হাদীস যেন স্থান না পায়। তাদের গ্রন্থে কোন দুর্বল হাদীস এসে পড়লে তাঁরা সেটির দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কীকরণে গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং যে হাদীসের ব্যাপারে তাঁরা নীরবতা পালন করবেন, সে হাদীস তাঁদের নিকট অন্তত হাসান শ্রেণীর তো হবেই।

## প্রথম কিতাব

ইমাম নাসায়ী رحمہ اللہ -এর **أَلْ مُجْتَبَىٰ مِنَ السُّنَنِ**। এ স্তরের সবচেয়ে উচ্চ

মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে **সুনানে নাসায়ী**। সুতরাং এতে এমন কোন হাদীস নেই যা ইমাম নাসায়ী رحمہ اللہ -এর নিকট হাসান শ্রেণীরও নিম্নে। তবে কোন হাদীস ব্যতিক্রম থাকলে সেটির দুর্বলতার সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন।



## দ্বিতীয় কিতাব

সুনানে আবু দাউদ। এতেও ইমাম আবু দাউস রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীসের ওপর নীরবতা অবলম্বন করেন, সে হাদীসটি তাঁর কাছে প্রমাণরূপে পেশ করার উপযোগী। তবে কখনো হাদীসের সনদে নগণ্য দুর্বলতা থাকে। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ এ ধরনের হাদীস অনুমোদন করেন এবং এর ওপর নীরবতাও অবলম্বন করেন। ইমাম হাফিয মুনযিরী রাহিমাহুল্লাহ আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছেন। তাতে তিনি নগণ্য দুর্বলতাও বিবৃত করা ব্যতীত ছেড়ে দেননি। সুতরাং আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ-এর যে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ব্যতীত হাফিয মুনযিরী ও নীরবতা অবলম্বন করেছেন শক্তির মান বেড়ে যাবে।

ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন, সুনানে আবু দাউদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হাদীস এমন, যেগুলো বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ও মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আবার কিছু কিছু হাদীস আছে, যা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত বা যে কোন একটির শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু হাদীস আছে এরূপ, যেগুলোর বর্ণনাকারীদের কারো মধ্যে স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা পাওয়া যায়। যার দরুন সেটি সহীহ থেকে হাসানের স্তরে পর্যবসিত হয়েছে। উক্ত তিন প্রকারের ওপর ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ সাধারণত নীরবতা অবলম্বন করেন। অবশ্য চতুর্থ প্রকার হাদীস যেগুলোর দুর্বলতা ও নীরবতা পালন করেন না। তবে কদাচিৎ কোথাও এরূপ হাদীস বিনা বাক্যব্যয়ে এ জন্যে উদ্ধৃত করে দেন যে, সেগুলোর অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

## তৃতীয় কিতাব

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ-এর أَلْجَامِعُ الْكَبِيرُ। এতে প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে তার বিশুদ্ধতার মানও সুস্পষ্ট বিবৃত করে দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে হাদীসের সকল গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থটি অনন্য। কেননা ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ সতর্কীকরণ ছাড়া কোন দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেননি। তবে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলোকে হাসান ও সহীহ আখ্যায়িতকরণে তুলনামূলক অমনোযোগী বলে অভিহিত করেছেন।

এ তিনটি কিতাব সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন মনীষী সুনানে দারিমীকেও দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলও দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এতে কোন হাদীস হাসান শ্রেণীর নিম্নের নয়। এ অভিমত সঠিক নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে, মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের অনেকগুলো বর্ণনা দুর্বল ও মুনকার

শ্রেণীর। এজন্যে কোন কোন আলেম এটাকে তৃতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর বাস্তবতাও এটাই। এখানে লক্ষণীয় যে, এ মতানৈক্য মূল মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল প্রসঙ্গে। <sup>১৫৮</sup> গ্রন্থটিও মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের অংশবিশেষ। এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> -এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> সংকলন করে মুসনদের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ অংশটি যে তৃতীয় স্তরের শামিল এ ব্যাপারে সবাই একমত।

## তৃতীয় স্তর

সেসব কিতাব এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোতে সহীহ, হাসান, যযীফ, মুনকার, মওযু সব ধরনের হাদীসই বিদ্যমান। এ স্তরের কিতাবগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতির আলোচনা বর্ণিত হলো।

১. **সুনানে ইবনে মাজাহ:** এটি যদিও বিশুদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থের শামিল। কিন্তু এতে দুর্বল ও মুনকার শ্রেণীর হাদীস এমন কি অন্তত ১৯টি বানোয়াট হাদীসও রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আলেমগণের এক বড় দল একে বিশুদ্ধ ৬টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেউ কেউ এর স্থলে ইমাম মালেক <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> কর্তৃক সংকলিত মুওয়াত্তাকে রেখেছেন। আবার কেউ রেখেছেন সুনানে দারেমীকে।
২. **সুনানে দারাকুতনী:** এটি ইমাম আবু আবদুল্লাহ আদ-দারাকুতনী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> -এর সংকলন। তিনি উঁচু স্তরের একজন হাফিযুল হাদীস। তিনি এ কিতাবে আইন বিষয়ক প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীসকে মূল পাঠ ও বর্ণনাসূত্রের বিভিন্নতার সাথে সংকলন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ জন্যে এ কিতাবখানি ইসলামী বিধি-বিধানের হাদীসসমূহের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। ইমাম দারাকুতনী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে তার সনদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেছেন। এ গ্রন্থখানিতেও সব ধরনের সরস-নীরস হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সাধারণত ইমাম দারাকুতনী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর দুর্বলতার ওপর সতর্ক করেছেন।
৩. **ইমাম বায়হাকী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> -এর আস-সুনানুল কুবরা:** ইমাম বায়হাকী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> ইমাম দারাকুতনী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> -এর শাগরেদ। তিনি এ কিতাবটি শাফিয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত মূলপাঠ মুখতাসার আল-মুযানীর বিন্যাস অনুযায়ী সংকলন করেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য শাফিয়ী মাযহাবের ফিকহের দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করা। যার দরুন তিনি তাঁর প্রামাণ্য হাদীসসমূহের সত্যায়ন এবং বিরোধী পক্ষের দলীল প্রমাণ দুর্বল সাব্যস্তকরণ ও তাতে খুঁত বের করণে সদা তৎপর। এ গ্রন্থখানির ওপর ইমাম হাফিয আলাউদ্দিন আল-মাদীনী <sup>রাহিমাহুল্লাহ</sup> যিনি ইবনুত তুরকমানী নামেও

খ্যাত, একটি পাদটীকা লিখেছেন। এর নাম **الْجَوْهَرُ النَّقِيُّ عَلَى سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ**। তিনি হানাফী মতাবলম্বী এবং হাদীসশাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এজন্যে তিনি ইমাম বায়হাকী رحمته الله-এর দলীল প্রমাণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এতে হানাফী চিন্তাধারার দলীল প্রমাণগুলোর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ভাঙুর পাওয়া যায়।

৪. **মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক:** এটি ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম আসসানআনী رحمته الله-এর সংকলন। তিনি ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর শাগরেদ এবং ইমাম বুখারী رحمته الله প্রমুখের শিক্ষকের শিক্ষক। এতে তিনি মারফু শ্রেণীর হাদীসগুলো ছাড়াও সাহাবা এবং তাবেয়ীনের আইনী মতামত তথা ফতোয়াসমূহও প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থেও সব ধরনের হাদীস পাওয়া যায়।

৫. **ইবনে আবু শায়বা** رحمته الله-এর **الْمُصَنَّفُ فِي الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَرِ**: এটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বা رحمته الله কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। তিনি ৬ ইমামের অধিকাংশ জনের শিক্ষাগুরু। এ গ্রন্থটির সংকলনরীতি মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকের অনুরূপ। এ উভয় গ্রন্থে হানাফী চিন্তাধারার দলীল-প্রমাণের এক বিরাট ভাঙুর পাওয়া যায়।

৬. **মুসনদুত তায়ালিসী:** এটি আবু দাউদ আত-তয়ালিসী رحمته الله-এর সংকলন। ইনি ইমাম আবু দাউদ رحمته الله-এর অগ্রজ। কোন কোন মনীষী বলেছেন, মুসনদ গ্রন্থ সংকলনে তিনি অগ্রবর্তিতার সম্মান লাভ করেছেন।

৭. **সুনানে সাঈদ ইবনে মাসসূর** رحمته الله: এ কিতাবে মু'দাল, মুনকাতা' ও মুরসাল হাদীস অধিক বিদ্যমান। এটি ভারতের লখনৌয়ের মজলিসে ইলমী প্রকাশ করেছে।

৮. **মুসনদুল হুমায়দী:** এর সংকলক ইমাম হুমায়দী رحمته الله ইমাম বুখারী رحمته الله-এর ওস্তাদ। তিনি ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর চরম বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর এ গ্রন্থখানিও ভারতের লখনৌয়ের মজলিসে ইলমী দু'খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

এ হলো কতিপয় কিতাব, যেগুলোর সূত্র অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছাড়া এ শ্রেণীর আরো অনেক কিতাব রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুসনদে বাযযার, মুসনদে আবু ইয়ালা আল-মুসিলী, মুসনদে আবদ ইবনে হুমাঈদ, মুসনদে আহমদ ইবনে মানী, আবু নুআইম আল-আসবাহানী رحمته الله-এর হিলয়াতুল আউলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া, আবু নুআইম আল-আসবাহানী رحمته الله ও ইমাম বায়হাকী رحمته الله-এর দালায়িলুন নুবুওয়াত, মুসনদে ইবনে জারীর, ইবনে জারীর رحمته الله-এর তাহযীবুল আসার, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িলিল কুরআন, তারীখুল

মূলক ওয়াল উমাম ও তাফসীরে ইবনে মারদুওয়াহসহ অনরূপভাবে তাফসীরের বহু সংখ্যক কিতাব এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তাফসীরে ইবনে কসীর এগুলো থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ইমাম হাফিয ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের একজন গবেষক। তিনি সাধারণত দুর্বল হাদীসসমূহের প্রতি সতর্কীকরণে অভ্যস্ত। এ স্তরের গ্রন্থাবলিতে কোন হাদীস প্রত্যক্ষ করে তার ওপর সে পর্যন্ত নির্ভর করা যাবে না, যে পর্যন্ত না সনদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করা হবে।

## চতুর্থ স্তর

এসব সে কিতাবগুলোর স্তর, যেগুলোর অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল। বরং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, এস্তরের গ্রন্থগুলো প্রত্যেকটি হাদীসই দুর্বল। যেমন- হাকীমুত তিরমিযী নামে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বাশার রাহিমাহুল্লাহ-এর نَوَازِرُ الْأُصُولِ -এর ৬০ অংশ বিশিষ্ট الْكَامِلُ فِي فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ইবনে আদী রাহিমাহুল্লাহ-এর ৬০ ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে। মুরতাযা আয-যাবীদী রাহিমাহুল্লাহ কতর্ক সংকলিত تَجْلُ الْعُرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ-র ভাষ্যগ্রন্থে আছে, এটি ৬০ ভলিউম সংবলিত। হাদীসের গঠনমূলক সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে ইবনে আদী রাহিমাহুল্লাহ-এর আল-কামিল গ্রন্থখানির স্থান অতীব উর্ধ্বে। একে পূর্ণাঙ্গতম গ্রন্থ মনে করা হয়। ইবনে তাহের রাহিমাহুল্লাহ হাদীসগুলো একত্র করে আরবী বর্ণমালার অনুক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। আল-কামিল গ্রন্থের পাদটীকা লিখেছেন ইবনুর রুমিয়া আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফাররাজ আল-উমুবি আল-আন্দালুসী আল ইশবীলী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর এ পাদটীকাটি আল-হাফী ফী তাকমিলাতিল কামিল নামে পরিচিত। এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। এরূপ আবু জা'ফর আল-উকায়লী রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবুয যুয়াফা ও আল্লামা দায়লামী রাহিমাহুল্লাহ-এর মুসনদুল ফিরদাওস চতুর্থ স্তরের কিতাব। এতে তিনি ১০ হাজার সংক্ষিপ্ত বাচনিক হাদীস আরবী বর্ণমালার অনুক্রম অনুযায়ী একত্র করেছেন। ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রাহিমাহুল্লাহ-এর তারীখুল খুলাফা, হাফিয ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ-এর ৮০ ভলিউমে মুদ্রিত তারীখে দামিশক এবং খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রায় ২০ ভলিউমে লিখিত তারীখে বাগদাদ এ সকল কিতাব চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

হাকীম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ-এর নাওয়াদিরুল উসূল, ইবনে আদী রাহিমাহুল্লাহ-এর আল-কামিল এবং উকাইলী রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবুয যুয়াফা সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর এ মন্তব্য অতীব যথার্থ। তিনি বলেন, এ গ্রন্থগুলোর হাদীস দুর্বল। এর কারণ যেসব মনীষী এ গ্রন্থগুলোতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের আলোচনা

লিখেছেন, সেই সাথে তাদের হাদীসগুলোও বর্ণনা করেন। কিন্তু অপর কিতাবগুলোতে এমন বর্ণনাসমূহ দুর্বল, যা অপর কোন কিতাবে বর্ণিত নেই। তাহলে সেগুলোতে এমন কিছুসংখ্যক হাদীস আছে যা বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছয়টিতেও বর্ণিত রয়েছে। এরূপ হাদীসগুলোকে সাধারণভাবে দুর্বল বলা যাবে না।

## পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরে সেসব গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো জাল হাদীসের আলোচনায় রচিত হয়েছে। যেমন- ইমাম ইবনুল জাওযী رحمته الله-এর *আল-মওযুআতুল কুবরা*, সানআনী رحمته الله-এর *আল-মওযুআত*, হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী رحمته الله-এর *আল-লা'আলিউল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মওযুআ*। এগুলোর ব্যাপারে সর্বজনবিদিত অভিমত হচ্ছে, এগুলো মওযু তথা জাল হাদীসসমূহের সংকলন।

## হাদীসশাস্ত্রে অধিক গ্রন্থ প্রণেতাদের প্রসঙ্গ

হাদীস গ্রন্থাবলির উক্ত স্তরসমূহের সাথে সেসব আলেম এবং মুহাদ্দিসীদের অবস্থাও জানা প্রয়োজন, যারা নিজ নিজ রচনাবলিতে প্রসঙ্গক্রমে অধিক হারে সনদ ব্যতীত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। যেমন- ইমাম গাযালী رحمته الله, আল্লামা ইবনুল জাওযী رحمته الله, হাফিয মুনযিরী رحمته الله, হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمته الله, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله, হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী رحمته الله, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمته الله, আল্লামা ইবনে কাইয়িম رحمته الله, আল্লামা কুরতুবী رحمته الله, আল্লামা নববী رحمته الله প্রমুখ।

১. ইমাম গাযালী رحمته الله ইসলামী দর্শন, আধ্যাত্মবাদ, দর্শন বিষয়ক বিদ্যাসমূহ ও ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের ইমাম। কিন্তু হাদীসশাস্ত্র নিয়ে তাঁর লিপ্ততা ছিল কম। তিনি স্বয়ং তাঁর একটি বইয়ে এর স্বীকারোক্তি করেছেন, হাদীসশাস্ত্রে আমার পুঁজি সীমিত। এজন্য দেখা যায় যে, ইমাম গাযালী رحمته الله তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে প্রচুর পরিমাণে দুর্বল, মুনকার ও মওযু হাদীস উল্লেখ করেছেন। বিশেষত তাঁর *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন* গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস আছে, যা মুহাদ্দিসীদের মাপকাঠিতে অনেক নিম্নস্তরের। এ জন্য কতিপয় মুহাদ্দিস মনীষী *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন* গ্রন্থের হাদীসগুলোর সনদ অনুসন্ধান ও এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। এর মধ্যে হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী رحمته الله-এর *المُعْنَى عَنْ خَلِّ الْأَسْفَارِ فِي الْأَسْفَارِ*

*الْمُعْنَى عَنْ خَلِّ الْأَسْفَارِ فِي الْأَسْفَارِ* গ্রন্থ বিখ্যাত। এতে উক্ত গ্রন্থের হাদীসগুলো নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। আল্লামা মুরতাযা আয-যাবীদী رحمته الله ও *إِتْحَافُ السَّادَةِ أَلْ مُتَّقِينَ فِي شَرْحِ إِيْحَاءِ الْمُتُوم* কিতাবে *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন* গ্রন্থের হাদীসসমূহের ওপর গবেষণায় মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করেছেন।

২. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক দ্বিতীয় আলেম হলেন আল্লামা ইবনুল জওযী رحمته الله। উল্লিখিত হয়েছে, তিনি হাদীস সমালোচনায় অত্যন্ত সতর্ক ও চরমপন্থী। এজন্য হাদীস বিষয়ের ওপর লিখিত তাঁর কিতাবগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর। যার দরুন দেখা গেছে, তিনি অনেক সহীহ হাদীসকেও মওযু আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য কথা, চরম পন্থা অনুসরণ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ওয়ায-নসীহতের জন্যে লিখিত বই পুস্তকগুলো যেমন- *তালবীসে ইবলীস*, *যাম্মুল হাওয়া*, *আত-তাবসিরা* প্রভৃতিতে নিজের হাদীস সমালোচনার মাপকাঠি অক্ষুন্ন রাখেননি। বরং সেগুলোতে তিনি যয়ীফ, মওযু ও মুনকার শ্রেণীর হাদীসগুলো কোন সতর্কীকরণ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।
৩. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক তৃতীয় আলেম হলেন হাফিয মুনিযরী رحمته الله। তিনি একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস এবং হাদীস গবেষক ও হাদীস গ্রন্থ সংকলক। অতএব তিনি কোন দুর্বল হাদীস সতর্কীকরণ ছাড়া লিপিবদ্ধ করতেন না। এ জন্যে তাঁর কোন হাদীস বিনা সমালোচনায় লিপিবদ্ধ করে দেয়া একথার প্রমাণ যে, তাঁর নিকট সে হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপনযোগ্য। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত কিতাব *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*-এ তিনি একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা না জানার ফলে অধিকাংশ মানুষ ভুলের শিকার হন। সে পরিভাষা হচ্ছে, যে বর্ণনা তাঁর নিকট সহীহ অথবা হাসান হবে, তা তিনি عَنْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন। যেমন- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবু হুরাইরা رحمته الله থেকে বর্ণিত)। কিন্তু যে হাদীস তাঁর নিকট দুর্বল, সেটা তিনি عَنْ دُونَ (অমুকের কাছ থেকে বর্ণিত) বলে বর্ণনা করেন। যেমন- رَوَى عَنْ ابْنِ عُمر (ইবনে ওসর رحمته الله হতে বর্ণিত)। সনদ নিয়ে তিনি কোন আলোচনা করতেন না। যাঁরা এ পরিভাষা সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা অন্যান্য প্রকারের হাদীসগুলোকেও এর ওপর নির্ভর করে প্রমাণরূপে পেশ করার যোগ্য মনে করেন।
৪. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক আলেমদের চতুর্থ জন হলেন হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمته الله। তিনি হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম, হাফিযুল হাদীস ও সমালোচক। আলেমগণ লিখেছেন, তাঁর প্রণীত *ফাতহুল বারী* ও *তালখীসুল হাবীর* কিতাব দুটোতে যে হাদীস কোন বাক্যব্যয়ে এসেছে, সেটি অন্তত হাসান হাদীস অবশ্যই হবে।
৫. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক আলেমদের পঞ্চম জন হচ্ছেন ইমাম হাফিয শাসসুদীন আয-যাহাবী رحمته الله। তিনি নিঃসন্দেহে হাদীসের একজন বিশিষ্ট সমালোচক। সুতরাং তাঁর কিতাবগুলোতেও কোন দুর্বল হাদীস প্রয়োজনীয় আলোচনা ছাড়া এমনিতেই এসে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে তাঁর *কিতাবুল কাবায়ির* গ্রন্থে দুর্বল হাদীসগুলোও এসে পড়েছে।

৬. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক আলেমদের ষষ্ঠজন হলেন ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী رحمہ اللہ। তিনি যদিও প্রতিটি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষকের মর্যাদার অধিকারী। তারপরও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে তিনি বেশ অমনোযোগী ছিলেন। এ জন্যে হাদীসশাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি অন্ধকারে লাকড়ি সংগ্রহকারী। তাই তিনি যখন কোন বিষয় প্রসঙ্গে হাদীস উদ্ধৃত করতেন, তখন সব ধরনের হাদীসই নিয়ে আসতেন। সেগুলো কোন প্রকার যাচাই-বাছাই করতেন না। যার দরুন তাঁর লিখিত *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, *তাকসীরে আদ-দুররুল মানসূর* ও *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন* গ্রন্থত্রয় প্রত্যেক প্রকার হাদীসের সমষ্টি।

*আল-জামিউস সগীর* গ্রন্থে যদিও তিনি সূচনাতে লিখেছেন, আমি এ কিতাবে কোন মিথ্যুক অথবা হাদীস জালকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করব না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি *আল-জামিউস সগীর* গ্রন্থে অনেক যয়ীফ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য *আল-জামিউস সগীর* গ্রন্থে উদ্ধৃত কিছু হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী رحمہ اللہ রচিত *আল-লাআলিউল মাসনূআ ফী আহাদীসিল মাওযূআ* গ্রন্থে জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কাজ পূর্বোক্ত বক্তব্যের পরিপন্থী হওয়ার অর্থ, এটা তাঁর দ্বারা ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে অথবা পরবর্তীতে তাঁর মত পাল্টে গেছে। একথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, *আল-জামিউস সগীর* কিতাবে প্রতিটি হাদীসের সাথে প্রদত্ত *ح*, *ص* অথবা *ض*-এর যে প্রতীক চিহ্ন প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা আব্বাসী আবদুর রাওফ আল-মুনাব্বী رحمہ اللہ ফয়যুল কদীর *শরহে জামিউস সগীর* কিতাবে লিখেছেন, উক্ত সংকেতগুলোর অনেকগুলোই পরবর্তীকালের লোকেরা সংযোজন করেছেন আর ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী رحمہ اللہ যা লিখেছেন, তাতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে।

৭. অধিক হাদীসগ্রন্থের সংকলক আলেমদের মধ্যে সপ্তম জন হলেন ইমাম আব্বাসী ইবনে তাইমিয়া رحمہ اللہ। তিনি হাদীসের ব্যাপারে প্রয়োজনানিরিক্ত কঠোর মনোভাবান্ন। সহীহ ও হাসান শ্রেণীর হাদীসকেও তিনি কোন কোন সময় দুর্বল আখ্যায়িত করেন। ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمہ اللہ *লিসানুল মীযান* গ্রন্থে ইউসুফ ইবনে হুসাইন ইবনে মুতাহহির আল-হুলী رحمہ اللہ-এর প্রসঙ্গে লিখেছেন, আব্বাসী ইবনে তাইমিয়া رحمہ اللہ *মিনহাজুস সুন্নাহ* গ্রন্থে অনেক সহীহ হাদীসকে প্রমাণরূপে পেশ করার অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।<sup>১</sup>

<sup>১</sup> ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *লিসানুল মীযান*, খ. ৬, পৃ. ৩১৯, ক্র. ১১৪৪

৮. অধিক হাদীস গ্রন্থের সংকলক অষ্টম হচ্ছেন আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম আল-জওযিয়া رحمہ اللہ। তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمہ اللہ-এর ছাত্র এবং ইলমে হাদীসে উঁচুস্তরে অধিষ্ঠিত। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীস উদ্ধৃতকরণে বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি দুর্বল হাদীসগুলোকে শুধু প্রত্যয়ন না করে বরং সেগুলো মুতাওয়াতিরের মতো অকাট্য ঘোষণা করতেন। আবার কখনো প্রমাণযোগ্য হাদীসকেও দুর্বল আখ্যায়িত করতেন।

৯. এ শ্রেণীর নবম আলেম হলেন আল্লামা ইমাম কুরতুবী رحمہ اللہ। তাঁর সম্পর্কে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ আল-হালাবী رحمہ اللہ *আল-আজওবাতুল ফাযিলার* পাদটীকায় লিখেছেন, তার নীতি ছিল তিনি যে হাদীস নির্ভরযোগ্য মনে করতেন, সূত্র টেনে উল্লেখ করতেন। পক্ষান্তরে যেগুলোর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হত, সেগুলো কোনরূপ সূত্র উল্লেখ ছাড়াই উদ্ধৃত করে দিতেন।

১০. দশম আলেম হলেন আল্লামা নববী رحمہ اللہ। তিনি হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বনকারী। তিনি সাধারণত সতর্কীকরণ ছাড়া দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেননি। কাজেই হাদীসের ব্যাপারে তাঁর কিতাবগুলোর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর *কিতাবুল আযকার* এ নিয়মের ব্যতিক্রম।

পরিশেষে এও মনে রাখতে হবে, ওয়ায, আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, জীবনচরিত, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ, সৃষ্টির সূচনাপর্ব এবং কুরআনের তাফসীর প্রভৃতির বর্ণনায় সাধারণ দুর্বল হাদীস বেশি রয়েছে। অতএব এ বিষয়গুলোর আলোচনায় উদ্ধৃত হাদীসগুলো গ্রহণে পরিপূর্ণ সতর্কতা ও তথ্যানুসন্ধান করে গ্রহণ করতে হবে।

## বর্ণনাকারীগণের (রাবী) স্তরসমূহ

হাদীসের বর্ণনাকারীদের স্তরসমূহ দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি এবং শিক্ষাগুরুর সঙ্গ লাভের দিক। দ্বিতীয় হচ্ছে তাঁদের সময়কাল ও ইতিহাসের দিক। প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাকারীদের স্তর পাঁচটি। আমাদের জানা মতে এ পঞ্চস্তর সর্বপ্রথম আল্লামা আবু বকর হাশেমী رحمہ اللہ স্বীয় কিতাব *গুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসায়* উল্লেখ করেছেন।

১. قَوِيُّ الضَّبْطِ، كَثِيرُ الْمَلَاَزِمَةِ (যাঁদের স্মৃতি শক্তি মজবুত এবং শিক্ষক বা শায়খের দীর্ঘ সংসর্গ লাভ করেছেন)।

২. قَوِيُّ الضَّبْطِ، قَلِيلُ الْمَلَاَزِمَةِ (যাঁদের স্মৃতিশক্তি মজবুত এবং শিক্ষাগুরুর সংসর্গ বেশি লাভ করেননি)।



৩. قَلِيلُ الضَّبْطِ، كَثِيرُ الْمَلَاَزِمَةِ (যাঁদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, অবশ্য তাঁরা শিক্ষাগুরু দীর্ঘ সংসর্গ লাভ করেছেন) ।
৪. قَلِيلُ الضَّبْطِ، قَلِيلُ الْمَلَاَزِمَةِ (যাঁদের স্মৃতিশক্তি স্বল্প মাত্রার, তাছাড়া তাঁরা শাইখের সংসর্গও অর্জন করেছেন কম) ।
৫. الضُّعْفَاءُ وَالْمَجَاهِلُ (দুর্বল ও অজ্ঞাত বর্ণনাকারীবৃন্দ) ।
- (ক) উক্ত পঞ্চম স্তরের দিক থেকে বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছয়টির নির্ভরযোগ্য হওয়ার মান নির্ণয় করা হয়েছে। ইমাম বুখারী رحمته الله আল্লায়হি-এর অবলম্বিত নীতি হলো, তিনি সব সময় শুধু প্রথম স্তরের রাবীদের হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন। তবে কখনো কখনো সাক্ষ্য হিসেবে দ্বিতীয় স্তরকেও নিয়ে আসেন। এ জন্য বিশুদ্ধতার দিক থেকে তাঁর জামে' গ্রন্থটি সর্বাত্মক গণ্য।
- (খ) ইমাম মুসলিম رحمته الله আল্লায়হি প্রথম দুটো স্তর তো নির্দিধায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কখনো কখনো ঘটনাক্রমে সাক্ষ্য হিসেবে তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের হাদীসগুলোও নিয়ে আসেন। সুতরাং বিশুদ্ধতার দিক থেকে তাঁর জামি' গ্রন্থটি দ্বিতীয় নম্বরে পড়ে।
- (গ) ইমাম নাসায়ী رحمته الله আল্লায়হি স্বতন্ত্রভাবে প্রথম তিন স্তরের বর্ণনাকারীদের হাদীসগুলো গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর আস-সুনান গ্রন্থটি তৃতীয় নম্বরে পড়ে।
- (ঘ) ইমাম আবু দাউদ رحمته الله আল্লায়হি যেহেতু উক্ত তিন স্তরের সাথে চতুর্থ স্তরের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলোও নিয়েছেন, এজন্যে তাঁর কিতাব পঞ্চম নম্বরে পড়ে।
- (ঙ) ইমাম তিরমিযী رحمته الله আল্লায়হি স্বতন্ত্রভাবে চতুর্থ স্তর এবং কোন কোন স্থানে পঞ্চম স্তরের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলোও নিয়ে এসেছেন, এ জন্যে তাঁর কিতাব পঞ্চম নম্বরে পড়ে।
- (চ) আর ইমাম ইবনে মাজাহ رحمته الله আল্লায়হি যেহেতু পঞ্চম স্তরের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসমূহ নির্দিধায় স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন, এ জন্যে তাঁর কিতাব ষষ্ঠ নম্বরে পড়ে।

সুনানে ইবনে মাজাহে রয়েছে যঈফ ও মুনকার বর্ণনাসমূহের বিরাট সমাবেশ। এমনকি এতে কোন কোন দুর্বল বর্ণনাও এসে পড়েছে। যেগুলোর সংখ্যা কেউ ১৭, কেউ ১৯, কেউ ২১ এবং কেউ ২৫ বলেছেন। এ জন্যে মুহাদ্দিসীদের এক শ্রেণী একে বিশুদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং এর স্থলে কেউ ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمته الله আল্লায়হি-এর মুওয়াত্তা, কেউ মুসনদে দারিমীকে রেখেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহ رحمته الله আল্লায়হি-এর বিন্যাস সৌন্দর্যের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস একে বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করার মতের প্রতি প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাদীস বর্ণনাকারীদের এ স্তরগুলো নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠির দিক থেকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের ১২টি স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে যখন কোন বর্ণনাকারীর কোন স্তর বর্ণনা করা হয়, তখন তা দ্বারা ঐতিহাসিক স্তরগুলোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمہ اللہ সর্বপ্রথম এ ঐতিহাসিক স্তরগুলো তাকরীবুত তাহযীবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী লেখকবৃন্দ তাঁরই অনুসরণ করেছেন। উক্ত স্তরগুলো হলো:

১. **طَبَقَةُ الصَّحَابَةِ (সাহাবীগণের স্তর):** এতে কোন প্রকার শ্রেণীবিভেদ ছাড়া সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত।
২. **طَبَقَةُ كِبَارِ النَّابِعِينَ (জ্যেষ্ঠ তাবেয়ীগণের স্তর):** যেমন- হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব رحمہ اللہ।
৩. **طَبَقَةُ الْوُسَطَى مِنَ النَّابِعِينَ (তাবেয়ীগণের মধ্যম স্তর):** যেমন- ইমাম হাসান আল-বসরী رحمہ اللہ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন رحمہ اللہ।
৪. **طَبَقَةُ مَا بَعْدَ الْوُسَطَى مِنَ النَّابِعِينَ (মধ্যস্তরের পরবর্তী স্তর):** যাদের বর্ণনাসমূহ সাহাবীগণের নিকট থেকে কম এবং জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের তাবেয়ীদের চেয়ে অধিক। যেমন- ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী رحمہ اللہ ও ইমাম কাতাদা رحمہ اللہ প্রমুখ।
৫. **طَبَقَةُ الصُّغَرَى مِنَ النَّابِعِينَ (তাবেয়ীগণের কনিষ্ঠ স্তর):** তাঁরা হচ্ছেন সেসব মনীষী, যাঁরা একজন অথবা দু'জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোন বর্ণনাই নেননি। যেমন- সুলাইমান আল-আ'মশ رحمہ اللہ ও ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ।
৬. **طَبَقَةُ الْأَخْرَيْنِ مِنَ النَّابِعِينَ (তাবেয়ীগণের শেষ স্তর):** তাঁরা সেসব মনীষী যাঁরা পঞ্চম স্তরের সমকালীন, কিন্তু তাঁরা কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেননি। যেমন- ইবনে জুরাইজ رحمہ اللہ। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাবিয়ী নন, কিন্তু তাবেয়ীদের সমকালীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে তাবেয়ীদের স্তরে গণ্য করা হয়েছে।
৭. **طَبَقَةُ كِبَارِ أَتْبَاعِ النَّابِعِينَ (জ্যেষ্ঠ তাবে' তাবেয়ীগণের স্তর):** যেমন- ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمہ اللہ ও ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ।
৮. **(তাবে' তাবেয়ীগণের মধ্যবর্তী স্তর):** যেমন- সুফিয়ান ইবনে উআয়না رحمہ اللہ ও সুফিয়ান ইবনে উলাইয়া رحمہ اللہ।

৯. **الطَّبَقَةُ الْوُسْطَىٰ مِنْ أَتْبَاعِ النَّابِعِينَ** (‘তাবে’ তাবেয়ীগণের কনিষ্ঠ স্তর): যেমন- ইমাম শাফিয়ী رحمہ اللہ, ইমাম আবদুর রায্যাক رحمہ اللہ প্রমুখ।
১০. **الطَّبَقَةُ الصُّغْرَىٰ مِنْ أَتْبَاعِ النَّابِعِينَ** (‘তাবে’ তাবেয়ীগণের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রাহক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ): যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمہ اللہ প্রমুখ।
১১. **طَبَقَةُ كِبَارِ الْأَخْبَانِ عَنْ تَبَعِ الْأَنْبَاءِ** (উপরোক্তদের মধ্যবর্তী স্তর): যেমন- ইমাম বুখারী رحمہ اللہ, ইমাম যুহলী رحمہ اللہ ও আলী ইবনুল মাদানী رحمہ اللہ প্রমুখ।
১২. **الطَّبَقَةُ الْوُسْطَىٰ مِنْهُمْ** (তাদের কনিষ্ঠ স্তর): যেমন- ইমাম তিরমিযী رحمہ اللہ ও তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ।

উক্ত ১২টি স্তরের প্রথম দু’স্তরের অধিকাংশ বর্ণনাকারী হলেন প্রথম হিজরী শতাব্দীর। আর তৃতীয় স্তর থেকে অষ্টম স্তর পর্যন্ত অধিকাংশ বর্ণনাকারী হলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর। অন্যদিকে নবম স্তর থেকে নিয়ে দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর।

## হাদীস শরীফ শিক্ষালাভের পদ্ধতিসমূহ

শায়খের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করাকে পরিভাষায় **مَحْبِلٌ** বলে।

এর আভিধানিক অর্থ ধারণ করা, বহন করা। হাদীস শিক্ষালাভের পদ্ধতি ৫ প্রকারে বিভক্ত। এ প্রকারগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. **السَّمْعُ** (শ্রবণ করা): এর অর্থ শিক্ষক হাদীস পড়বেন এবং ছাত্র তা শুনবে। এ অবস্থায় ছাত্রের জন্যে **حَدَّثَنِي** (আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন), **أَخْبَرَنِي** (আমাকে সংবাদ দিয়েছেন), **سَمِعْتُ فَلَانًا يَقُولُ** (অমুককে বলতে শুনেছি) এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করলে অনুমতি রয়েছে। অন্তর গুলোর মধ্যে কোন শব্দটি উত্তম এতে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম **سَمِعْتُ** (আমি শুনেছি) শব্দটিকে আবার কেউ **حَدَّثَنِي** (আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দটিকে প্রাধান্য দেন।
২. **الْفَرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** (ওস্তাদের নিকট পঠন): অর্থাৎ ছাত্র হাদীস পড়বে এবং ওস্তাদ শুনবেন। এ অবস্থায়ও শিষ্যের জন্যে ওস্তাদের কাছ থেকে বর্ণনাদান বৈধ। এ প্রকারে **أَخْبَرَنِي** (আমাকে খবর দিয়েছেন), **أُنْبِئَنِي** (আমাকে সংবাদ দিয়েছেন) এবং **قُرِئْتُ عَلَيْهِ** (আমি তাঁর নিকট হাদীস পড়েছি); এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়। ছাত্র যদি একাধিক হয় তাহলে **أُنْبِئْنَا فِي أَخْبَرْنَا** বলা হয়। কোন কোন সুধী এ দু’শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাহলে দলের মধ্য

থেকে যে ছাত্র হাদীস পড়ে যায় সে أَخْبَرَنَا আর যারা তার পঠন শুনছেন তারা قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (তাঁর নিকট পড়া হয়েছে এ অবস্থায় যে, আমি শুনেছি) বাক্যটি বাড়ানো উত্তম।

অতঃপর এতে মতানৈক্য রয়েছে যে, السَّامِعُ ও الْقُرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ এ দুইয়ের কোন পদ্ধতি উত্তম? ইমাম মালিক আলায়াহি ও ইমাম শাফিযী আলায়াহি থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা السَّامِعُ (শ্রবণ) উত্তম মনে করেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা আলায়াহি-এর নিকট الْقُرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ উত্তম। এর কারণ এ রূপ অবস্থায় সতর্কতা ও নিশ্চয়তার মাত্রা অধিক। কেননা তখন ছাত্র কোন ভুল করলে শিক্ষক তা সংশোধন করতে পারেন।

ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়া আলায়াহি চূড়ান্ত অভিমত এই বর্ণনা করেছেন যে, আসল ব্যাপার হচ্ছে, ভুল থেকে বাঁচা আর এ জিনিসটা যে পদ্ধতিতে অধিক লাভ হবে সেটিই উত্তম। অবস্থার বিভিন্নতার কারণে কখনো এটা السَّامِعُ-এর মধ্যে এবং কখনো الْقُرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ-এর মধ্যে লাভ হয়।

৩. الْمُرَاسَلَةُ أَوْ الْمَكَاتِبَةُ (পরস্পর পত্রবিনিময় অথবা লেখালেখি): অর্থাৎ চিঠিতে লিখে কারো কাছে হাদীস বর্ণনা করে পাঠানো। এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ অবস্থায় ছাত্রের জন্যে বর্ণনা করা কখন বৈধ হয়। কারো মতে, শায়খের পক্ষ থেকে বর্ণনার সুস্পষ্ট অনুমতি না হবে, তাবৎ ছাত্রের জন্যে বর্ণনা করা বৈধ নয়। কিন্তু গ্রহণযোগ্য কথা হলো, যদি ছাত্র শায়খের লেখা চেনেন তা হলে বর্ণনা করা বৈধ। যদিও অনুমতির সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকে। তবে এ অবস্থায় حَدَّثَنِي অথবা أَخْبَرَنِي শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, বরং كَتَبَنِي (আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন) অথবা كَتَبَ إِلَيَّ (আমার কাছে পত্র লিখেছেন) অথবা أَرْسَلَ إِلَيَّ (আমার কাছে চিঠি প্রেরণ করেছেন); এসব শব্দ ব্যবহৃত হবে।

৪. الْمُتَنَاوَلُ (অর্পন): অর্থাৎ শায়খ নিজস্ব বর্ণনাগুলোর একটি কপি ছাত্রকে অর্পন করবেন। কোন কোন মনীষী এ অর্পনের ভিত্তিতে বর্ণনা করার জন্যেও শায়খের সুস্পষ্ট অনুমোদন জরুরি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখানেও চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, এ জন্য সুস্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন নেই। ছাত্রের যদি এ আস্থা থাকে যে, শিক্ষক এ কপিটি বর্ণনার জন্য দিয়েছেন, তা হলে সে বর্ণনা করতে পারে। তবে এখানেও حَدَّثَنِي অথবা أَخْبَرَنِي বলা বৈধ নয়। বরং نَاوَلَنِي (আমাকে অর্পন করেছেন) বলতে হবে।

৫. **الْوَجَادَةُ (প্রাপ্তি):** অর্থাৎ শায়খের বর্ণনাগুলোর সমষ্টি শায়খ ছাড়া অন্য কোন মারফতে প্রাপ্ত হওয়া। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের অভিমত, এ ধরনের সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেননা হতে পারে শায়খ এ হাদীস সমষ্টি জাল হাদীসসমূহ স্মরণ রাখার জন্য তৈরি করেছেন। কোন কোন মনীষী এ ধরনের সূত্র থেকেও বর্ণনা বৈধ মনে করে থাকেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় যদি শায়খের লেখার ওপর নির্ভর করা হয়, তা হলে **وَجَدْتُ بِحُطِّ فُلَانٍ** (অমুকের লেখায় পেয়েছি) শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা দুষণীয় নয়।

## হাদীস বিশুদ্ধ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার মূলনীতি

যদিও হাদীসের বিশুদ্ধায়ন ও দুর্বলায়ন একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি এবং **جرح وتعديل** (জারাহ ও তা'দীল) শাস্ত্রে সংকলিত হয়েছে। এখানে সেটা পূর্ণাঙ্গরূপে বিবৃত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সাধারণভাবে মানুষের দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত কতিপয় নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হলো, যেগুলো হাদীসের অধ্যায়সমূহে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করার ফলে লোকেরা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের ওপর প্রশ্ন তোলেন যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের পেশকৃত প্রমাণগুলো দুর্বল যা মূলত সত্য নয়।

## প্রথম মূলনীতি

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন, সহীহ হাদীসগুলো কেবল সহীহ আল-বুখারী অথবা সহীহ মুসলিমেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কোন কোন ব্যক্তির ধারণা এই যে, যে হাদীসটি সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে থাকবে না, সেটি অবশ্যম্ভাবীরূপে দুর্বল হবে এবং সেটি কোন অবস্থায়ই সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। অথচ তাদের এ ধারণাটা সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা সেটি সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম উদ্ধৃত হওয়ার ওপর নির্ভর করেনা। বরং যে কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা তার নিজস্ব সনদের ওপর নির্ভরশীল। স্বয়ং ইমাম বুখারী رحمتهما الله বলেছেন, আমি স্বীয় গ্রন্থে সহীহ হাদীসগুলো পুরোপুরি সংকলন করতে পারিনি। সুতরাং এটা নিশ্চিত সম্ভব, কোন কোন সহীহ হাদীসও সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে নেই। অথচ সনদের দিক থেকে সেটি সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত কোন কোন হাদীসের চেয়েও উঁচুমানের। যেমন— মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী **ما تامة** ইলায়হিল হাজাতু গ্রন্থে ইবনে মাজাহের এমন হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেগুলোর সনদ সহীহ আল-বুখারীর

সনদের চেয়েও উত্তম। সুতরাং বুখারী শরীফকে যে, أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ (কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হয় সেটা সামগ্রিক দিক থেকে বলা হয়, প্রত্যেক হাদীসের পৃথক পৃথক বিবেচনায় নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর إِنْهَاءُ السَّكَنِ إِلَى مَنْ يَطْلُعُ দেখুন।

## দ্বিতীয় মূলনীতি

হাদীসের শুদ্ধায়ন ও দুর্বলায়ন অত্যন্ত নাজুক কাজ। এ জন্যে অতীব প্রশস্ত ও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং তাঁরাই এ কাজের যোগ্য, যারা এ শাস্ত্রে ইজতিহাদের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর ভিত্তিতে ইমাম হাফিয় ইবনে সালাহ রাহমতুল্লাহু আলায়হ তাঁর মুকাদ্দিমায় অভিমত প্রকাশ করেছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরে নতুনভাবে কোন হাদীস সহীহ অথবা যঈফ আখ্যায়িত করার অধিকার কারো নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম তাঁর এ অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। বাস্তব কথা হচ্ছে, শুদ্ধায়ন ও দুর্বলায়নের কাজ কোন বিশেষ সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কাক্ষিত শর্তাবলি যার মধ্যেই পাওয়া যাবে, তিনি কোন হাদীস বিশুদ্ধ ও দুর্বলতা নির্ধারণের কাজ করেছেন এবং সেটা গোটা মুসলিম জাতি নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন- ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম হাফিয় ইবনে হাজার আল-আসকলানী রাহমতুল্লাহু আলায়হ, আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী রাহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়া রাহমতুল্লাহু আলায়হ, হাফিয় যায়লাঈ রাহমতুল্লাহু আলায়হ ও হাফিয় ইরাকী রাহমতুল্লাহু আলায়হ-এর মতো হাদীসশাস্ত্রবিদগণের সবাই হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরের লোক। তবুও তাঁদের শুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ের কাজ নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে। শেষ যুগে এসে ভারতের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রাহমতুল্লাহু আলায়হ ও এ মর্যাদায় উত্তীর্ণ ছিলেন। হাদীসের ওপর শাস্ত্রীয় আলোচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্তমানে যা হচ্ছে তা ফিতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

## তৃতীয় মূলনীতি

কখনো একই হাদীস অথবা বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। একজন বর্ণনাকারীকে কেউ দুর্বল আবার কেউ বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ প্রেক্ষাপটে কার অভিমত গ্রহণ করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ভারতের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আবদুল হাই লখনৌবী রাহমতুল্লাহু আলায়হ *আল-আজওয়িবাতুল ফাযিলা* কিতাবের ১৬১-১৮০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারকথা হলো, কোন হাদীস অথবা বর্ণনাকারী সম্পর্কে

হাদীসবেত্তা আলেমগনের ভিন্ন ভিন্ন অভিমতগুলোর মাঝে প্রাধান্য দেয়ার পন্থা ৩টি। যথা—

১. প্রথম পন্থা হলো, যদি দু'জন আলেমের একজন হাদীসের শুদ্ধতা নিরূপণে অসতর্ক আর অপরজন সতর্কতাপরায়ণ হন, তা হলে দ্বিতীয় জনের অভিমতের ওপর আমল করতে হবে। যেমন— ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহু আলায়হি একটি হাদীস শুদ্ধ সাব্যস্ত করেন, আবার ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি সেটাকে দুর্বল বলেন। তাহলে ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হাকিম হাদীসের শুদ্ধতা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা নিরূপণে অসতর্ক। এমনিভাবে যদি ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহু আলায়হি একজন বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্ত আর অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অভিশ্রুত বলেন, তা হলে ইবনে হিব্বানের অভিমত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তিনি অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীদেরকেও বিশ্বস্তদের মধ্যে গণ্য করেন।
২. দ্বিতীয় পন্থা হলো, দু'জন হাদীসবিশারদের মধ্যে যদি একজন কউরপন্থী এবং অপরজন মধ্যপন্থী হন, তা হলে মধ্যপন্থীজনের অভিমতই গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন— ইমাম ইবনুল জাওযী রহমতুল্লাহু আলায়হি অত্যন্ত কউরপন্থী। পক্ষান্তরে ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হি অথবা ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি হলেন মধ্যপন্থী। সুতরাং ইমাম ইবনুল জাওযী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর তুলনায় এ উভয় মুহাদ্দিসের অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।
৩. হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষোবী রহমতুল্লাহু আলায়হি হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে উদ্ধৃত করেন, জারাহ-তাদীলের ইমামগণ কালের দিক থেকে ৪ শ্রেণিতে বিভক্ত। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হি এ শ্রেণিগুলোতে কে কউরপন্থী এবং কে মধ্যপন্থী তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।
  ১. প্রথম স্তর হলো শু'বা রহমতুল্লাহু আলায়হি এবং সুফিয়ান রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর। এদের মধ্যে শু'বা রহমতুল্লাহু আলায়হি কউরপন্থী।
  ২. দ্বিতীয় স্তর হলো ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহমতুল্লাহু আলায়হি ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর। এ দুজনের মধ্যে ইয়াহইয়া কউরপন্থী।
  ৩. তৃতীয় স্তর ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহমতুল্লাহু আলায়হি এবং আলী ইবনুল মাদীনী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর। এ দু'জনের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহমতুল্লাহু আলায়হি কউরপন্থী।
  ৪. চতুর্থ স্তর হলো ইবনে আবু হাতিম রহমতুল্লাহু আলায়হি ও ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর। এ দু'জনের মধ্যে ইবনে আবু হাতিম রহমতুল্লাহু আলায়হি কউরপন্থী।

অতএব যেখানে এসব মহৎ ব্যক্তির মাঝে মতানৈক্য হবে, সেখানে কউরপন্থী জনের অভিমত পরিহার করে মধ্যপন্থীজনের অভিমত গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা আবদুল হাই লখনৌবী رحمۃ اللہ علیہ আরও বর্ণনা করেন, পরবর্তী হাদীসবিশারদ আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনুল জাওযী رحمۃ اللہ علیہ, ওমর ইবনে বদর আল-মুসলী, আল্লামা জুযিকানী رحمۃ اللہ علیہ, হাফিয সানআনী رحمۃ اللہ علیہ, সফরুস সা'আদার গ্রন্থকার আবুল ফাতাহ আল-আযরী رحمۃ اللہ علیہ ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمۃ اللہ علیہ ও কউরপন্থী। সুতরাং হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمۃ اللہ علیہ, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمۃ اللہ علیہ, হাফিয ইরাকী رحمۃ اللہ علیہ ও হাফিয যায়লাঈ رحمۃ اللہ علیہ প্রমুখ মধ্যপন্থী আলেমদের বিপরীতে পূর্বোক্ত কউরপন্থীদের অভিমত পরিত্যক্ত হবে।

### চতুর্থ মূলনীতি

উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যার পক্ষের দলীল প্রমাণ অধিক শক্তিশালী সাব্যস্ত হবে সে পক্ষের অভিমত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এ কাজ সে ব্যক্তিই করতে পারেন, যার হাদীসশাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও গভীরতা রয়েছে। মধ্যবর্তী আলেমগণের মতানৈক্যে এ তৃতীয় পন্থাই অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে পক্ষদ্বয়ের দলীল-প্রমাণের সমতাবিধান করার যোগ্যতা থাকে, তা হলে তিনি কারো অভিমতকে প্রাধান্য দিতে পারে অন্যথায় যার মতের ওপর অধিক আস্থা হবে, তাঁরটাই গ্রহণ করতে পারেন।

### পঞ্চম মূলনীতি

কোন হাদীসকে শুদ্ধ বা দুর্বল বলে অভিহিত করা একটি ইজতিহাদী ব্যাপার। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইবনে হুমাম رحمۃ اللہ علیہ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। এর মধ্যে মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য হতে পারে, সেহেতু কোন মুজতাহিদের ওপর আপত্তি তোলার কোন সুযোগ নেই। অধিকন্তু একজন মুজতাহিদের কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা একথার প্রমাণ যে, সে হাদীসটি তাঁর কাছে প্রমাণরূপে পেশ করার উপযোগী। সুতরাং সেটার বিকল্পরূপে অন্য কোন মুহাদ্দিসের কথা উপস্থাপন করা সমীচীন নয় যে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা একজন মুজতাহিদের উক্তি অপর মুজতাহিদের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

### ষষ্ঠ মূলনীতি

কখনো এরূপ হয় যে, পূর্বেকার ব্যক্তি যেমন ইমাম আবু হানিফা رحمۃ اللہ علیہ -এর নিকট একটি হাদীস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে পৌঁছেছে, কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালে উক্ত হাদীসের বর্ণনাসূত্রে কোন দুর্বল বর্ণনাকারী এসে পড়েছে। যার দরুন পরবর্তীকালের লোকেরা সেটাকে দুর্বল ঘোষণা করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, পরবর্তীদের এ দুর্বল অভিহিতকরণ ইমাম আবু হানিফা رحمۃ اللہ علیہ -এর বিরুদ্ধে



দলীলরূপে দাঁড় করানো যাবে না। হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ ব্যতীত আলেমগণও এ মূলনীতির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্যে জরুরি নয় যে, যে হাদিসটি ইমাম বুখারী রহমাহুল্লাহ আলিয়াহি-এর সময়কালে দুর্বল আখ্যায়িত হয়েছে, সেটা পূর্ববর্তীকালেও দুর্বল ছিল।

### সপ্তম মূলনীতি

ইমাম হাফিয ইবনে সালাহ রহমাহুল্লাহ তাঁর মুকাদ্দমায় লিখেছেন, আমরা যখন কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করি, তখন তার অর্থ এ নয় যে, তা বাস্তবে নিশ্চিতরূপে বিশুদ্ধ হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাতে সহীহ তথা বিশুদ্ধতার শাস্ত্রগত সেসব শর্ত বিদ্যমান, যা হাদীসশাস্ত্রবিদগণ সহীহের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। অতএব প্রবল ধারণা হচ্ছে, সেটা বাস্তবে সহীহ হবে। কেননা বাস্তবে বিশুদ্ধতার বিশ্বাস সনদের قَوِّمٌ (পারস্পর্য্য) ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং সহীহ বলে আখ্যায়িত কোন হাদীসেও বাস্তবে ভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দ্বারাও ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া কোন বর্ণনাকারীর কোন অলীক ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে এ সম্ভাবনার ওপর তখন পর্যন্ত আমল করা বৈধ নয়, যখন পর্যন্ত সেই সম্ভাবনার প্রমাণ প্রাভাস ও অপরাপর শক্তিশালী দলীর-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হবে। অতএব অপর শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ যদি নির্দেশ করে যে, উক্ত হাদীসের বর্ণনায় কোন বর্ণনাকারীর অলীক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে সে হাদীস বর্জন করা যেতে পারে।

এভাবে আমরা যখন বলি, অমুক হাদীস দুর্বল, তখন তার অর্থ এ নয় যে, সেটা বাস্তবেও দুর্বল এবং মিথ্যা বরং এর অর্থ, তাতে সহীহ অথবা হাসান হাদীসের শাস্ত্রসম্মত শর্তাবলি পাওয়া যায় নেই। যার দরুন সেটি এতটুকু নির্ভরযোগ্য নয় যে, তার ওপর শরীয়তের কোন মাসআলার ভিত্তি স্থাপন করা যায়। অন্যথায় এ সম্ভাবনা রয়ে যায় যে, দুর্বল বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ নির্ভুল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কেননা দুর্বল বর্ণনাকারীও সদা-সর্বদা ভুল করেন না, কিন্তু এরূপ সম্ভাবনার ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করা যাবে না, যে পর্যন্ত না অন্যান্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সেটা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, কোন মুজতাহিদের নিকট এরূপ শক্তিশালী প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, যেগুলোর ভিত্তিতে তিনি দুর্বল সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্জন করে বসেন অথবা দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় তাঁকে বিশুদ্ধ হাদীস বর্জনকারী অথবা দুর্বল হাদীসের ওপর আমলকারী বলা যাবে না।

প্রকৃত কথা হলো, এসব মনীষী আলোচ্য হাদীস এ জন্যে গ্রহণ করেছেন, অপরাপর দলীল প্রমাণ দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা

আলায়াহি যদি কোন জায়গায় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে দুর্বল হাদীস বেছে নেন, তা হলে তিনিই একমাত্র তিরস্কারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবেন কেন? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী আলায়াহি -এর **إِنْهَاءُ السَّكَنِ إِلَى مَنْ يُطَالَعُ** কিতাবটি দেখুন।

## অষ্টম মূলনীতি

কোন দুর্বল হাদীস যদি **تَعَامُلُ** (পারস্পরিক কাজ-কারবার) দ্বারা সমর্থিত হয় অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেয়ীনের আমল সে অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তা হলে নিজস্ব দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রামাণ্য হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস আলায়াহি আহকামুল কুরআন নামক তাফসীর এবং একাধিক মুহাদ্দিস ও মূলনীতিবিদ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন—

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَلَأُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

হযরত আয়িশা আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল আলায়াহি ইরশাদ করেন, ‘দাসীগণের তালাক দু’তালাক আর তার ইদ্দত দু’হায়েয।’<sup>১</sup>

এ হাদীসটি দুর্বল। তবু সাহাবী ও তাবেয়ীদের **تَعَامُلُ** (কর্মে) এটি প্রমাণযোগ্য হাদীস হয়ে গেছে। যেমন— ইমাম তিরমিযী আলায়াহি এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেন,

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُظَاهِرٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

‘হযরত আয়িশা আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি গরীব শ্রেণির হাদীস। মুযাহির ইবনে আসলামের হাদীস ছাড়া মারফু’রূপে বর্ণিত কোন সূত্রে তা আমাদের জানা নেই। ইলমে হাদীসে এ হাদীসটি ছাড়া তার অপর কোন পরিচিতিও নেই। তবুও নবী করীম আলায়াহি -এর সাহাবীগণ ও অন্যান্য হাদীসশাস্ত্রবিদগণের নিকট এ হাদীসের ওপর আমল স্বীকৃত বিষয়।’<sup>২</sup>

অনুরূপভাবে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ».

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ১১৮২

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ১১৮২ দ্রষ্টব্য

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাযাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অস্তিম উপদেশ নেই।’

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْفَاتِلُ لَا يَرِثُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযাঃ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না।’<sup>১</sup>

এ উভয় হাদীসের বর্ণনাসূত্রগুলোও দুর্বল। তবুও মুহাদ্দিসগণ হাদীসদ্বয় সাদরে গ্রহণের কারণে এগুলোকে প্রামাণ্য মনে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «الطَّهْرُ مَأْوُهُ، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযাঃ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নদীর পানি পবিত্র, তার মৃত হালাল।’<sup>২</sup>

হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের অনেকেই দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার ফলে এ হাদীসকে প্রামাণ্য মনে করা হয়। এ মূলনীতি অনুসারেই ইমাম আবু হানিফা রাযাঃ এবং হানাফী মাযহাব অনুসারী হাদীসবিদগণ কখনো এরূপ দুর্বল হাদীস বেছে নেন, যা সাহাবী ও তাবেয়ীনের কর্মরীতি দ্বারা সমর্থিত। দুর্বল হাদীস বিভিন্ন সহীহ বর্ণনাসূত্র দ্বারা বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলে প্রমাণরূপে পেশ করার উপযোগী মনে করা হয়।

## নবম মূলনীতি

দুটো প্রামাণ্য হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে ফিকহবিদ ও হাদীসশাস্ত্রবিদগণের এক দল সাধারণভাবে সনদের শক্তিমত্তার দিকটিকে অগ্রাধিকারের কারণ সাব্যস্ত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্কৃততম হাদীস বেছে নেন। কিন্তু এরূপ স্থানগুলোতে ইমাম আবু হানিফা রাযাঃ-এর চিন্তাধারা হলো, তিনি সেই হাদীসকেই প্রাধান্য দেন যা কুরআনুল করীম অথবা শরীয়তের সামগ্রিক মূলনীতির সাথে অধিক সঙ্গতিশীল। সেটা সনদের শক্তিমত্তার দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হোক বা না হোন।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আমাদের প্রকাশিত ১. হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি, ২. ইমামুল হাদীস পরিচিতি ও ৩. সিহাহ সিত্তা পরিচিতি।

<sup>১</sup> আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১৭২, হাদীস : ৪১৫৩

<sup>২</sup> আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, খ. ১, পৃ. ২৩৯, হাদীস : ৪৯৭

## ফিকহ পরিচিতি

### ইলমুল ফিকহের সংজ্ঞা

মহান আল্লাহ বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ①

‘তাদের অন্তর রয়েছে, তবে তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।’

فَقْه (ফিকহ) শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ে যথার্থ ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা। আর ‘ফকীহ’ ওই ব্যক্তি যিনি عِلْمُ الدِّينِ তথা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গভাবে জানেন। যেমন— আল্লাহর নবী বলেন,

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي».

‘আল্লাহ তা’আলা যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি হলাম বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দানকারী।’

এখানে فَقْه থেকে تَفْقَهُ শব্দ ব্যবহার করে ইলমে দীনের সঠিক জ্ঞান দানের কথা বোঝানো হয়েছে। কাজেই আমরা একথা বলতে পারি যে, فَقْহ শব্দের অর্থ কোন ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। ইলমুল ফিকহ যেহেতু শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো মানুষের সম্মুখে পেশ করে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে ‘ইলমুল ফিকহ।’

পরিভাষায় ইলমুল ফিকহ বলা হয় এমন একটি বিদ্যা, যাতে কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দলীল-প্রমাণ দ্বারা ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান স্থির করা হয়। আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী رحمته الله বলেন,

الْفَقْهُ مَعْقُولٌ مِّنْ مَّنْقُولٍ.

① আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ ৭:১৭৯

② আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৫, হাদীস: ৭১; হযরত মু’আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

‘কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যে আহকাম বিবেকে ধরা পড়ে, তাই ফিকহ।’<sup>১</sup>

অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে শরীয়তের যেসব বিধান বিবেকসম্মত মনে হয় তাই ফিকহ।

এ ব্যাপারে مِفْتَاحُ السَّعَادَةِ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

هُوَ عِلْمٌ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِبْطَاطُهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ  
التَّفْصِيلِيَّةِ.

‘ফিকহ এমন একটি বিদ্যা বা শাস্ত্র যা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের নানান শাখা বিধি-বিধান আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করে।’<sup>২</sup>

যারা ফিকহ চর্চা করেন তাদের নিকট এটাই ফিকহের সংজ্ঞা। তবে যারা ফিকহের পাঠক ও বর্ণনাকারী তাদের নিকট ফিকহের সংজ্ঞা অনেকটা সহজ। যেমন—

أَلْفَقَهُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

‘ইসলাম স্বীকৃত বিধি-বিধানের সমষ্টি হচ্ছে ফিকহ।’

যে কিতাবে ইলমুল ফিকহের আলোচনা স্থান পায় তাকে ফিকহের কিতাব বলে যেমন *শরহুল বিকায়া* একটি ফিকহের কিতাব। মনে রাখা আবশ্যিক যে, ইলমুল ফিকহ এমন কোন নতুন শাস্ত্র নয় যা মহানবী কিংবা সাহাবীদের যুগের পরে তৈরি করা হয়েছে। এটা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্গত বিধি-বিধান সংকলন। কৃষক যেমন ধান জমি থেকে কেটে ঘরে তোলে। তারপর সেদ্ধ করে ছাঁটাই করে চাল প্রস্তুত করত বাজারে ক্রেতার হাতে তুলে দেয়, আর ক্রেতা কোন ঝামেলা ছাড়াই কিছু টাকার বিনিময়ে তার মালিক হয় তেমনি মুজতাহিদগণ কুরআন-হাদীস খুঁজে যাচাই-বাছাই করে সঠিক বিষয়টি সর্বাসাধারণের হাতে তুলে দেন। এটা নিঃসন্দেহে আবিষ্কার; সৃষ্টি নয়।

### ফকীহের পরিচয়

যিনি جُتِّهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ যে আলিম কুরআন-সুন্নাহ চম্বে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্গমনের ক্ষমতা রাখেন মূলত তিনিই فَقِيْهُ (ফকীহ)। তবে যারা ফিকহ নিয়ে গবেষণা করেন, ফিকহ পড়ান তাদেরকেও রূপকার্থে ফকীহ বলা যায়।

<sup>১</sup> আস-সুযুতী, *আল-হাওয়া লিল-ফাতাওয়া*, খ. ২, পৃ. ৩৪২

<sup>২</sup> তাশ কুবরা যাদা, *মিফতাহুস সা’আদা ওয়া মিসবাহুস সিয়াদা ফী মাওযু’আতিল উলূম*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

## ফিকহের আলোচ্য বিষয়

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো, أَفْعَالُ الْعِبَادِ بِإِغْتِيَارِ النَّصُوصِ  
অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে বান্দার কার্যাবলি আলোচনা করা।

বান্দার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুভাগে বিভক্ত:

১. اَلْعِبَادَةُ (আল্লাহর গোলামী) ও
২. اَلْمُعَامِلَاتُ (দুনিয়ার যাবতীয় লেনদেন)।

আর ইলমুল ফিকহ মানুষের এ দুটো দিক নিয়েই আলোচনা করে।

## ফিকহের উদ্দেশ্য

ইলমুল ফিকহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

## ফিকহের গুরুত্ব

একজন মুমিন কিংবা মুসলিমের নিকট অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ ফিকহ শাস্ত্রেই কেবল বিস্তারিতভাবে একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। কী সে করবে, আর কী থেকে সে বিরত থাকবে, কী খাবে, কী খাবেনা, কোনটা কিভাবে সম্পাদন করতে হবে, কোন কাজ তার জন্যে ফরয, কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নাহ ইত্যাদি কেবল ফিকহ শাস্ত্রেই সহজে পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য কুরআন ও হাদীসে এ সব কিছুই বিদ্যমান। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ থেকে এসব বিধি-বিধান উদ্ধার করা লাখে একজনের পক্ষেও কঠিন কাজ। সঙ্গত কারণেই ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব সর্বাধিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ۖ

‘কি হলো মুমিনদের! তাদের মধ্য হতে দলে দলে লোক দীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে বেরাচ্ছে না কেন? যাতে তারা শিক্ষা শেষে ফিরে এসে স্বজাতির লোকদের সতর্ক করতে পারে।’

এখানে মূলত ﴿لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ দ্বারা ইলমুল ফিকহ শিক্ষাই উদ্দেশ্য।

ইমাম বায়হাকী হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন,

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯:১২২

«لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ الدِّينِ الْفَقْهُ».

‘প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি ভিত্তি থাকে, আর দীনের (ইসলামের) ভিত্তি হলো ইলমুল ফিকহ।’<sup>১</sup>

মনে রাখা আবশ্যিক, কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম যে তাগিদ দেয়া হয়েছে এর মূল লক্ষ্য হলো দীনের প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। اَعْلَمُ الْفَقْهُ হচ্ছে اَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ-এর ভাণ্ডার। কাজেই যারা কুরআন ও হাদীস থেকে আহকাম নির্গত করার ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্যে ইলমুল ফিকহ অধ্যয়ন করা ফরয। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

‘ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।’<sup>২</sup>

এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, এখানে ইলম দ্বারা সে ইলম উদ্দেশ্য যা তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল, হারাম, পাক, নাপাক ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। আর এসব জ্ঞান কুরআন-হাদীস পড়ে সাধারণের পক্ষে অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই আমরা বলব যে, ইসলামী জিন্দেগী যাপনের ক্ষেত্রে ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব সর্বাধিক।

## ফিকহ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি মানুষের গর্ভস্থ দ্রুণাবস্থা থেকে গুরু করে তার লাশ কবরে রাখার পর পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধ-অবৈধতার যথাযথ আইনি সমাধান রয়েছে ফিকহ শাস্ত্রে। ইলমুল ফিকহ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য লাভ করা সকলের ওপর অত্যাাবশক না হলেও ফিকহী বিধি-বিধান যা মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন তা শিক্ষা করা শর্তাতিতভাবে সকলের ওপর ফরয। যেমন- হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছধারণা থাকা সকলের ওপর আবশ্যিক, যা কিনা কেবল ফিকহের কিতাবেই পাওয়া যায়। এসব না জানলে কোন সাধারণ মু’মিনের জন্যেও ইসলামী যিন্দেগী যাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি মাসআলা আবিষ্কার করে জীবন ধারণের মত লোক পৃথিবীতে

<sup>১</sup> আল-বায়হাকী, *শু’আবুল ঈমান*, খ. ৩, পৃ. ২৩১, হাদীস: ১৫৮৪; হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৪; হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

বিশেষ করে বর্তমানে বিরল। কাজেই ন্যূনতম ইসলামী যিন্দেগী যাপনের জন্যে হলেও ফিকহ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

## ফিকহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইলমুল ফিকহের কোন স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হত তখনই মানুষ স্বয়ং নবীজীর নিকট ছুটে যেত এবং তাঁর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক জবাব পেয়ে যেত। নবী ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে সাহাবীদের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হত। এদিকে মহানবী ﷺ-এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদার শাসনামলে ইসলামের আলো আরবের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে, ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে বিভিন্ন দেশ, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন আবহাওয়া ও ভিন্ন সংস্কৃতির হাজার হাজার মানুষ। সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন আইনি জটিলতা। এরই আলোকে খলিফাগণ কুরআন-সুন্নাহ বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান করতে থাকেন।

খুলাফায়ে রাশিদার যুগ অতিক্রান্ত হলে উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে ইসলামের আলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণ ভারত, স্পেন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। একই সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে এবং কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাগত ভিন্নতা হেতু শিয়া, খারিজী, রাফিযী, জাবরিয়া, কাদরিয়া, মুরজিয়া ইত্যাদি নানা মতবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এ সকল মতের অনুসারীরা নিজেদের ইচ্ছার স্বপক্ষে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি করতে শুরু করে।

এদিকে নওমুসলিমদের অধিকাংশ অনারব হওয়াতে কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তা থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাধারণ আরবদের পক্ষেও কুরআন সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোন সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের সহজ লভ্যতার দারুণ অভাব দেখা দেয়। এ সুযোগে কোন মুসলিম শাসক নিজেদের ক্ষমতা ও মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার মানসে নিজেদের খেলাল খুশিমতো আইন প্রণয়ন করে তা ইসলামী আইন বলে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে চালিয়ে দেয়।

বলাবাহুল্য ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির ফলে মুসলমানদের জীবনে এমন কিছু সমস্যা এসে উপস্থিত হয় যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআন কিংবা হাদীসে খোলাখুলি উল্লেখ নেই। ফলে এ সকল সমস্যার সমাধানে নানা মতের



মুসলমানগণ নানা অভিমত পোষণ করে। এতে করে সাধারণ মুসলামানদের জন্যে ইসলামী আইনের যথার্থ অনুসরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলামী বিশ্বের এ কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ, হযরত রাবীয়াতুর রায় রাহিমাহুল্লাহ [ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষক], ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ মহামনীষীদের মনে ইলমুল ফিকহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও তা সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়ে ওঠেছিল। ফলে অসংখ্য মুজতাহিদ ইলমুল ফিকহ নিয়ে কঠোর সাধনা করেন এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্যে একটি পরিপূর্ণ ফিকহ শাস্ত্র উপহার দেন।

## ফিকহশাস্ত্রের বিস্তার

উমাইয়া যুগে হাদীস সংকলনের সূচনা হলেও তৎকালে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ ফিকহগ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। আব্বাসীয় যুগে ফিকহ চর্চা, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন প্রচেষ্টা সফল হয়। আব্বাসীয়গণ সরকারি নীতি হিসেবে ইসলামী সমাজব্যবস্তার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হওয়ায় তাদের সময় হাদীস ও ফিকহ চর্চার এই তিন কেন্দ্রে যথাক্রমে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আওয়ামী রাহিমাহুল্লাহ-এর স্বতন্ত্র মাযহাবের উৎপত্তি হয়। পর্যায়ক্রমে এসব এলাকায় আবির্ভূত হন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ ফিকহী ইমামগণ।

## ফিকহের ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিক সূত্রমতে, দ্বিতীয় হিজরীর তৃতীয় দশক থেকে সুগঠিতভাবে ইলমুল ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। তারপর থেকে অদ্যাবধি ফিকহ শাস্ত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের কাজ নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে। বর্ণনার সুবিধার্থে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইলমুল ফিকহ সম্পাদনা ও এর ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন, নিম্নে এ তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা বর্ণনা হলো।

### প্রথম বা প্রাচীন যুগ (হিজরী ১৩০-৪০০)

যদিও হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়া থেকেই কেউ কেউ বিভিন্ন ফিকহী আহকাম নিজেদের নোটবুকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন কিন্তু সেগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট নাম ও নীতি-কানুন ছিল না। মূলত হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক থেকে ফিকহুল ইসলামী শিরোনামে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয় এবং তা হিজরী চতুর্থ শতকের প্রথম নাগাদ অব্যাহত থাকে। এ সময়ের

আগেই ইলমুল ফিকহের মৌলিক নীতিমালা ও আহকামসমূহ সুবিন্যস্তভাবে সম্পাদিত হয়। এ সময়ে বহুসংখ্যক মুজতাহিদ ইলমুল ফিকহ নিয়ে তোড়জোড় গবেষণা শুরু করেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রথম, প্রধান, অগ্রণী ও পথিকৃৎ ছিলেন, তিনি হলেন নুমান ইবনে সাবিত ওরফে আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি। তাঁকে ইমাম আযম বলা হয়। তিনি ৪০ জন ইসলামী গবেষক (মুজতাহিদ)-এর সমন্বয়ে একটি জেনারেল কমিটি গঠন করেন। এর মধ্য হতে দশ জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে বিশেষ (উচ্চ পর্যায়ের) কমিটি গঠন করে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৩২ হিজরী থেকে ১৪৪ হিজরী পর্যন্ত দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিত্বে এ কমিটি ‘ফিকহে হানাফী’ নামে একটি বিশাল গ্রন্থ সম্পাদন করে। এতে ৮৩ হাজার সমস্যার সমাধান উল্লিখিত হয়। *কিতাবুস সিয়ানা* গ্রন্থের বর্ণনা, ইমাম সাহেবের সংকলিত সমস্ত মাসআলার শাখা-প্রশাখাসহ ১২৯০০০০-এরও উপরে।<sup>১</sup>

তাঁকে অনুসরণ করে কাছাকাছি সময়ে আরো কয়েকজন বিখ্যাত মুজতাহিদ নিজেদের চিন্তা-চেতনার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ফিকহের মূলনীতি ও গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই সফলতাও পান। তাঁরা নিজেদের গবেষণাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণীয় করে তুলতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে চারজন মুজতাহিদকে ইমাম বলা হয়, যারা নিজেদের সম্পাদিত ফিকহের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন:

১. ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি; তাঁর মাযহাবের নাম হানাফী মাযহাব,
২. ইমাম মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হি; তাঁর মাযহাবের নাম মালিকী মাযহাব ও
৩. ইমাম আশ-শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হি; তাঁর মাযহাবের নাম শাফেয়ী মাযহাব,
৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু আলায়হি; তাঁর মাযহাবের নাম হাম্বলী মাযহাব।

এ চারজন ইমামের এমন অনেক সহচর ও সহযোগী ছিলেন, যারা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ইজতিহাদে পারদর্শী। ফলে তাঁরা স্ব-স্ব মাযহাবকে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রাখেন। এ সময় সাধারণ লোকদের মাঝে মাযহাব অনুসরণের প্রিয়তা ব্যাপকতর হতে থাকে।

## দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগ (হিজরী ৪০০-৭০০)

হিজরী চতুর্থ শতকের শুরু থেকে সপ্তম শতকের শেষ অবধি এযুগের ব্যাপ্তি। এ যুগে এসে মুজতাহিদগণ স্বতন্ত্র ফিকহ সম্পাদনার খেয়াল ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসায়েলের ওপর জোর গবেষণা চালান। এ

<sup>১</sup> (ক) আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিকহশাফের ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৪৪; (খ) ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

সময় তারা নিজ নিজ মাযহাবের সত্যতা, যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে তথ্যনির্ভর বহুসংখ্যক বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ যুগেই মাযহাব চতুষ্টয় মুসলিম উম্মাহর নিকট সর্বজনগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এ মর্মে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, চারটি মাযহাবই সত্য ও অনুসরণযোগ্য।

ফলে সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দমত মাযহাব গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি খলিফাগণও নিজেদের পছন্দসই মাযহাবের ফকীহদেরকে সরকারি কাযী নিয়োগ করত সংশ্লিষ্ট মাযহাবের প্রণীত আইনের আলোকে রাষ্ট্র ও বিচারকার্য পরিচালনা শুরু করেন। এতে করে ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণার দৃষ্টি কুরআন হাদীস থেকে ফিকহের প্রণীত মূলনীতি ও মাসায়েলের ওপর নিবদ্ধ হয়। আর সাধারণ জনতা প্রশ্রাতিভাবে মাযহাব মেনে চলতে থাকে।

এ যুগে ইলমুল ফিকহের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফিকহী মাসায়েলের টীকা-চিহ্ননী ও ব্যাখ্যা সম্বলিত শত শত গ্রন্থ এসময় রচিত হয়। ফলে এ যুগেই ইলমুল ফিকহ সর্বদিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে পরবর্তী যুগে ইলমুল ফিকহের মূলনীতি নিয়ে আর কোন গবেষণা না হলেও ফকীহদের প্রণীত আহকামের কোন কোন ব্যাপারে নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ যুগ থেকেই বিশ্ব মুসলিম জীবন-যাপনের ব্যাপারে মূলত পাঁচটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চার মাযহাবের অনুসরণ করতে যেয়ে দৃশ্যত তারা চারটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একই সাথে মদীনার মুসলমানসহ বিশ্বের আরো কতিপয় অঞ্চলের মুসলমানগণ মাযহাবের বিরোধিতায় লিপ্ত হন এবং তারা সরাসরি কুরআন হাদীসের অনুসরণের কথা ব্যক্ত করেন। তাদেরকে বলা হয় আহলে হাদীস।

### তৃতীয় যুগ (হিজরী ৭৫০-আজ অবধি)

আব্বাসীয় খলীফাদের পতনকালে আনুমানিক ৭৫০ হিজরী সাল থেকে ইলমুল ফিকহের তৃতীয় যুগ শুরু হয়। এ যুগের আলিমগণ ফিকহী মাসায়েল অবগতির জন্যে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করতেন। এমনকি অনেকে তা জায়েযও মনে করতেন না। তাদের যুক্তি হলো, যারা ফিকহী মাসায়েল সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তাঁরা বর্তমান যুগের আলিমদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও যোগ্য ছিলেন। তাছাড়া চার মাযহাব সত্য ও অনুসরণীয় এ ব্যাপারে উম্মাহের ইজমা হয়েছে বলেও তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন। কাজেই ফিকহী আহকামের কোন ব্যাপারে এমন কোন সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দেয়া জায়েয হবে না, যা চার মাযহাবের কোন একটিতেও নেই। তাদের ভাষায় মুসলমানদের ওপর মাযহাব মেনে চলা ফরয। এ জাতীয় প্রচারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়লে ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলিমগণও শরয়ী আহকাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণার

ইচ্ছে পোষণ করতে পারেন নি। তারা ফিকহের প্রণীত ফতোয়াগুলো যথার্থ কি-না অথবা একই ব্যাপারে যেখানে চার ইমাম চার রকম অভিমত পোষণ করেছেন ঐ চারটি অভিমতের মাঝে কোনটি অধিক বিশুদ্ধ ও সমাজসম্মত তা ভেবে দেখার সাহসও করতেন না। কেবল ফিকহের কিতাব নিজে মুখস্থ করতেন এবং অপরকে মুখস্থ করানোর কাজে সময় দিতেন। ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিশ্বের প্রায় ৮০ ভাগ মুসলিম এ যুগে মাযহাবের অনুসারী হয়ে পড়ে এ জন্যে এ যুগকে তাকলীদের যুগ বলা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগের পর থেকে আর কারো জন্যে ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই মনে করা হতো; সবাইকে কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে।

তবে কুরআন ও সুন্নাহের ভাষ্য মতে, ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। যোগ্য আলিমগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ধৃত সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। তাঁদের ওপর সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাব মেনে চলা আবশ্যিক নয়।

### প্রথম যুগে ফিকহী মাসায়েল সম্পাদনার পদ্ধতি

সুগঠিতভাবে সর্বপ্রথম যিনি ইলমুল ফিকহের সম্পাদনার কাজে হাত দেন তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি। তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর মৃত্যুর পর তিনি এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু উমাইয়াগণ ইমাম সাহেবের বিরোধিতায় নামলে তিনি ফিকহ সম্পাদনার কাজ স্থগিত রেখে ফিকহ গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। ১৩২ হিজরী সালে উমাইয়া ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটলে তিনি তোড়জোড় ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন।

প্রথমে তিনি সেকালে সেরা চল্লিশজন মুজতাহিদ নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এটার নাম ছিল মজলিসুল আম বা সাধারণ পরিষদ। এঁদের মধ্য হতে অভিজ্ঞ ও আইন বিশেষজ্ঞ দশজনকে নিয়ে মজলিসুল খাস বা বিশেষ উচ্চ পরিষদ গঠন করেন। এ উচ্চ বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হতে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি, ইমাম যুফার রহমতুল্লাহু আলায়হি, ইমাম দাউদ আততায়ী রহমতুল্লাহু আলায়হি, ইমাম আসাদ ইবনে ওমর রহমতুল্লাহু আলায়হি, ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ রহমতুল্লাহু আলায়হি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়িদ রহমতুল্লাহু আলায়হি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আযম সাহেব সমাজে সৃষ্ট সমস্যা বোর্ডের সদস্যদের সম্মুখে পেশ করতেন এবং সকলে মিলে এর যথার্থ সমাধান বের করতেন। কখনো বা বোর্ডের সদস্যদের কেউ প্রশ্নাকারে সৃষ্ট সমস্যা তুলে ধরতেন। এভাবে প্রশ্নোত্তর আকারে দিনরাত অধিবেশন চলতে থাকে। প্রতিদিন যে সকল সমাধানে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন তা ফতওয়া (রায়) হিসেবে লিখে রাখা হতো। পাশেই লিখে রাখা হতো দলীল-প্রমাণ।

এভাবে বছরের পর বছর গবেষণার সাথে সাথে সম্পাদনার কাজ চলতে থাকে। এ পর্যায়ে সমাজে সৃষ্ট যাবতীয় সমস্যার সমাধান লিপিবদ্ধকরণ শেষ হয়ে

যায়। তখন ইমাম আযম সাহেব ও তাঁর সম্পাদনা বোর্ডের সদস্যগণ অনাগত দিনে কিরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং অনাগত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানও লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম আযম সাহেব ছিলেন বোর্ডের মধ্যমণি। সকলেই যুক্তি-তর্কের সাথে কুরআন-সুন্নাহর দলীল উল্লেখ করে ইমাম আযম সাহেবের ফতোয়ার অপেক্ষা করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফতোয়ার সাথে বোর্ডের কোন সদস্যের তেমন মতানৈক্য দেখা যেত না। কখনো যদি কোন সদস্য তার অভিমতের ওপর অটুট থাকতেন না তখন তার অভিমতটিও দলীল-প্রমাণসহ লেখা হতো।

বলাবাহুল্য ইমাম আযম সাহেব সবার সেরা ও তাঁদের মধ্যমণি, তাই বলে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তি মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হত এমনটি নয়। বরং কুরআন সুন্নাহর দলীল ও যুক্তি প্রমাণে যা সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হতো তাই হতো ফতোয়া। এর প্রমাণ আমরা হানাফী মায়হাবে পাই। যেখানে ইমাম আযম সাহেবের মতের ওপর ফতোয়া না হয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতের ওপর ফতোয়া হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন ইমাম আযম সাহেবের ছাত্র ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। কাজেই একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, ফিকহে হানাফীতে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কোন প্রভাব ছিল, বরং তা ছিল দলীল-প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করা।

কোন সমস্যার সমাধান প্রথমে কুরআনে অন্বেষণ করা হত। কুরআনে পেলো তার আলোকেই ফতোয়া দেয়া হতো। কুরআনে কোন সমাধান সরাসরি না পেলো কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত ব্যাখ্যা বিশে-ষণের দিকে দৃষ্টি দেয়া হত, এখানেও না পেলো বিশুদ্ধ হাদীসের আশ্রয় নিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফতোয়া দেয়া হত। প্রয়োজনে ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহসানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানপূর্বক রায় দেয়া হত।

বলাবাহুল্য দলীল-প্রমাণ কেবল আক্ষরিক দাবির মাঝে বন্দি না রেখে এ পরিষদ সামাজিক বাস্তবতার সাথে মিল রেখে ফতোয়া প্রদান করেছে। যে কারণে বান্দার জন্যে দীন সহজ হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশও যথাযথভাবে পালিত হয়েছে।

এভাবে চুল-ছেঁড়া বিশে-ষণের মধ্য দিয়ে সম্পাদনার কাজ একটানা প্রায় ১২ বছর (হিজরী ১৩২-১৪৪) ধরে চলে। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁরা ৮৩ হাজার সমস্যার সমাধানের ফতোয়া সম্বলিত একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এ সংকলনের নাম দেয়া হয় ‘ফিকহে হানাফী’ বা কুতুবে হানাফী।

এ সংকলনে ৩৮ হাজার মাসআলা ছিল ইবাদত সংক্রান্ত। বাকি ৪৫ হাজার মাসআলা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, আচার-বিচার, লেন-দেন,

ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, পরবর্তিতে ঐ সংকলনের মাসায়েল সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সুখের বিষয়, অদ্যবধি মানুষ এমন কোন সমস্যায় পড়েনি যার সমাধান ফিকহে হানাফী তথা মাযহাবে হানাফীতে নেই। সঙ্গত কারণে ইমাম আযম সাহেবের জীবদশায়ই এ মাযহাব বিশ্বের বুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে সমাসীন হতে সক্ষম হয়। বর্তমান মুক্তচিন্তার যুগেও যে হানাফী মাযহাবের অনুসারীই পৃথিবীতে সর্বাধিক তা বলা নিঃপ্রয়োজন।

এখানে বলে রাখা ভালো, ইমাম আযম সাহেবের সম্পাদিত ফিকহের সূত্র ধরে পরবর্তিতে বহুসংখ্যক ফকীহ নিজেদের স্বকীয়তা দিয়ে অনেক ফিকহ এর কিতাব রচনা করেছেন; মাযহাবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালের বিচারে, চারটি মাযহাব ছাড়া বাকিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

### তবাকাতুল ফুকাহা (ফকীহদের স্তর)

আল-জাওয়াহিরুল মুযীয়া ফীত-তবাকাতিল হানাফিয়া নামক গ্রন্থে ফিকহ বিশেষজ্ঞদের সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে স্তরগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো,

#### প্রথম স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الدِّينِ

এ স্তরের ফকীহগণ সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদেরকে ‘মুজতাহিদ ফিদ দীন’ বলা হয়। এঁদের মধ্যে চার ইমাম যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রাহ), ইমাম মালিক رحمته الله আলমালিকি, ইমাম শাফিয়ী رحمته الله আলমালিকি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمته الله আলমালিকি প্রধান।

#### দ্বিতীয় স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الْمَذَاهِبِ

এ স্তরের ফকীহগণও ইজতিহাদের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তবে তারা সরাসরি দীনের মাঝে ইজতিহাদ না করে ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত নীতির আলোকে গবেষণা করতেন, তাই তাঁদেরকে ‘মুজতাহিদ ফিল-মাযাহিব’ বলা হয়। এঁদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ رحمته الله আলমালিকি, ইমাম যুফার رحمته الله আলমালিকি, ইমাম মুহাম্মদ رحمته الله আলমালিকি প্রমুখ প্রধান। উল্লেখ্য যে, তাঁরা কখনো কখনো ইমাম সাহেবদের প্রণীত ফতোয়ার বিপরীতেও মত পোষণ করতেন এবং অনেকাংশে তা গৃহীতও হয়েছে।

#### তৃতীয় স্তর: مُجْتَهِدٌ فِي الْمَسَائِلِ

এ স্তরের ফকীহদের ইজতিহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সরাসরি কুরআন সুন্নাহতে ইজতিহাদ না করে ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত মাসায়েল নিয়ে ইজতিহাদ করেছেন। তাই এ স্তরের ফকীহদেরকে ‘মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল’

নামে অভিহিত করা হয়। এঁদের মধ্যে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আলায়াহি, ইমাম তাহাবী আলায়াহি, ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী আলায়াহি, ইমাম শামসুল আয়িম্মা সারাখসী আলায়াহি, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী আলায়াহি, ইমাম হালুয়ায়ী আলায়াহি প্রমুখ প্রধান। তাঁরা সকলেই ফিকহের বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

### চতুর্থ স্তর

এ স্তরের ফকীহদেরকে **أَصْحَابُ التَّخْرِيجِ** বলা হয়। তাঁরা ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে মাসআলার সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। তাঁরা চার ইমামের প্রণীত মাসায়েল ও মূলনীতির ওপর গবেষণা করে দৃষ্টান্তের সাহায্যে নতুন নতুন খণ্ড মাসআলা আবিষ্কার করতেন। তাই তাঁদের ‘আসহাবে তাখরীজ’ নামে অভিহিত করা হয়। ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকলেও তাদেরকে সরাসরি মুজতাহিদ বলা হয় না। কারণ, তারা ইজতিহাদ করেছেন মাসায়েল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং তারা অনেক খণ্ড মাসআলা আবিষ্কার করেছেন বৈকি। কাজেই তাদেরকে যদি ‘মুজতাহিদ ফিত-তাখরীজ’ বলা হতো, তা অত্যাুক্তি হতো না। তাঁরা হলেন, ইমাম আবু বকর আল-রাযী আলায়াহি, ইমাম খাসসাফ আলায়াহি ও তাঁদের সমসাময়িকগণ।

### পঞ্চম স্তর

তবাকাত প্রণেতার মতে, এ স্তরের ফকীহদের মুজতাহিদ বলা হবে না। তবে কুরআন-সুন্নাহ ও ইলমুল ফিকহ বিষয়ে তাঁরা যে দক্ষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা পূর্ববর্তী ফকীহদের প্রণীত মাসায়েল আকলী ও নকলী দলিলের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ করে কোন অভিমতটি অধিক শুদ্ধ ও অনুকূল তা নির্ণয় করতেন।

উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ফকীহগণ একই ব্যাপারে একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। এ স্তরের ফকীহগণ ঐসব অভিমত হতে একটিকে প্রাধান্য দিতেন অর্থাৎ যে অভিমতটি প্রাধান্য পেতে পারে সে অভিমতটির স্বপক্ষে উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করে তা বর্ণনা করতেন। তাই তাদেরকে **أَصْحَابُ الزَّجْجِ** বলা হয়। এঁদের মাঝে ইমাম আবুল হাসান আল-কুদরী আলায়াহি, ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মুরগীনানী আলায়াহি ও তাঁদের সমসাময়িক ফকীহগণ প্রধান।

### ষষ্ঠ স্তর

এ স্তরের ফকীহগণ মুজতাহিদ ছিলেন না। তাঁরা দুর্বল, সবল, মাশহুর, বিরল, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি মাসায়েল নির্ণয় করেছেন। তাঁরা

কোন মাসআলাকে অপর কোন মাসআলার ওপর প্রাধান্য দেননি” বরং পূর্ববর্তী ফকীহগণ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা তাদের কিতাবে পাশা-পাশি উল্লেখ করে প্রমাণিত বা পাখ্যক্য নির্ণয় করেছেন মাত্র। তাই তাদেরকে **أَصْحَابُ السُّنَنِ** তথ্য ‘বাছাইকারী’ বলা হয়ে থাক। এঁদের মধ্যে ফকীহ আল-কারওয়ানী **আলায়াহি**, হযরত জামালুদ্দীন হুসাইনী **আলায়াহি**, হযরত হাফিযুদ্দিন নাফসী **আলায়াহি** প্রমুখ প্রধান। দুর্বল ও সবল অভিমত চিহ্নিত করার পূর্ণ যোগ্যতা তাদের ছিল। কানযুদ দাকায়িক, আল-বিকায়া, মাজমা, ফাতহুল কাদীর, বাহরুর রায়িক, মুখতাসারুল মাআনী প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা এ স্তরের ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত।

### সপ্তম স্তর

এ স্তরের ফকীহগণ কেবল ইলমুল ফিকহ অধ্যয়ন করেন নিজে মাসায়েল জানার জন্যে এবং অপরকে জানানোর জন্যে। যোগ্যতা থাকা না থাকা বড় কথা নয়; ইলমুল ফিকহ যেহেতু পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই, তাই এ স্তরের ফকীহগণ ফিকহের কিতাব পড়ে মানুষকে শুনাবেন; ফিকহের কিতাব দেখে মাসায়েল বর্ণনা করবেন; নিজের খেয়াল-খুশি মতো ফতোয়া প্রদানের কোন অধিকার তাদের নেই। এ শ্রেণীর ফকীহগণ সাধারণ মানুষের মতই মুকাল্লিদ তথা মাযহাবের নিরংকুশ অনুসারী।

### মাযহাবসমূহ

ইসলামের ফিকহ ৪টি শাখায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এদের প্রতিটি শাখাতেই হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের আইনবেত্তাগণের উদ্ভাবিত নীতির ভিত্তির ওপর স্বতন্ত্র আইনগ্রন্থসমূহ রচিত হয়। এ শাখা চতুষ্ঠয় বা মাযহাবসমূহের মধ্যে সামান্যই অমিল দেখা যায়। এসব মাযহাব যাদের প্রবর্তনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। যথা—

**এক. হানাফী মাযহাব:** ইমাম আবু হানিফা **আলায়াহি** কর্তৃক প্রবর্তিত মাযহাব হানাফী মাযহাব নামে খ্যাত। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে এ মাযহাব অনুসৃত হয়। যেমন— তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত।

**দুই. মালিকী মাযহাব:** ইমাম মালেক **আলায়াহি** কর্তৃক প্রবর্তিত মাযহাব মালিকী মাযহাব নামে খ্যাত। মরক্কো, উত্তর মিসর, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এ মাযহাব অনুসৃত হয়।

**তিন. শাফিয়ী মাযহাব:** ইমাম শাফিয়ী **আলায়াহি** কর্তৃক প্রবর্তিত মাযহাব শাফিয়ী মাযহাব নামে খ্যাত। মিসর, দক্ষিণ আরব, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও সিরিয়ায় এ মাযহাব বিশেষভাবে অনুসৃত হয়।



চার. হাম্বলী মাযহাব: ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল رحمته الله تعالى কর্তৃক প্রবর্তিত মাযহাব হাম্বলী মাযহাব নামে খ্যাত। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে এ মাযহাবের প্রভাব প্রবলভাবে বিরাজ করে। বর্তমানে আরবে এ মাযহাব সীমাবদ্ধ।

এছাড়াও আহলুল হাদীস নামে একটি মাযহাব বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান। বর্তমানে আরব এবং মিসরেও এদের মাযহাব পরিলক্ষিত হয়। এরা প্রাচীন আহলুল হাদীস ও যাহিরীগণের ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়। এরা নির্দিষ্ট কোন মাযহাব বা ইমামের তাকলীদ (تقليد) তথা অনুসরণ করে না বিধায় তাদেরকে عَيْرُ مُقَلِّدٍ (গাইরে মুকাল্লিদ) নামেও অভিহিত করা হয়।

## ফিকহশাস্ত্র পরিচিতি

أَصُولُ الْفِقْهِ অর্থ ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ। এটি এমন শাস্ত্র যাতে মুসলিম ফিকহ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূল সূত্রসমূহের বিবরণ রয়েছে। উসূলে ফিকহকে বলা হয়, ইসলামী আইনশাস্ত্রের নীতিবিজ্ঞান। এটা হলো ইসলামী আইনের মান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণসমূহের বিজ্ঞান। ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি ৪টি। যথা- কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এগুলোকে শরীয়তের উসূলে আরবা'আ (চারটি মূল ভিত্তি) বলা হয়। এগুলো হতে যে সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় তার মান নির্ধারণ করা, অর্থাৎ কোন প্রকার বিধান ফরয, কোন প্রকার ওয়াজিব, কোন প্রকার হারাম, কোন প্রকার মাকরুহ, কোনটি মুবাহ হবে, সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণই উসূলে ফিকহের কাজ। এভাবে চার উসূল বলতে পবিত্র কুরআন-হাদীস ছাড়াও ইজমার শর্তাদি এবং কিয়াসের প্রয়োগ প্রণালী বোঝায়।

## ফিকহশাস্ত্রের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ: أَصْلُ শব্দটি أَصْلُ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ۞ يُبْتَدَىٰ عَلَيْهِ غَيْرُهُ অর্থাৎ যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।<sup>১</sup> যেমন- থাম বা স্তম্ভ হচ্ছে ছাদের জন্য أَصْلُ (আসল বা মূল)। কেননা ছাদের ভিত্তি থামের ওপর স্থাপন হয়েছে।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন,

<sup>১</sup> আল-মাহবুবী, আত-তাওয়াহীহ লি-হাল্লি গাওয়ামিযিত তানকীহ, খ. ১, পৃ. ১৩

مَا يُبَيِّنُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ إِيْتَاءَ حَسْبًا أَوْ عَقْلًا.

পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় أَصْلُ শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১. كِتَابُ اللَّهِ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السُّنَّةِ —যেমন- الرَّاجِعُ তথা শক্তিমান বা অগ্রগণ্য। অর্থঃ সূন্যাহর তুলনায় কিতাবুল্লাহ অগ্রগণ্য।
২. الْقَاعِلُ مَرْفُوعٌ أَصْلٌ مِنَ النَّحْوِ —যেমন- الْقَاعِدَةُ তথা পদ্ধতি বা নিয়ম। অর্থঃ কর্তা পেশবিশিষ্ট হওয়া ইলমে নান্নর একটি নিয়ম।
৩. طَهَارَةُ الْمَاءِ أَصْلٌ —যেমন- الْإِسْتِصْحَابُ তথা স্বভাব বা মৌলিক অবস্থা। অর্থঃ পবিত্রতাই পানির মৌল অবস্থা।
৪. ﴿أَفِيئُوا الصَّلَاةَ﴾ أَصْلٌ لُّوْجُوبِ الصَّلَاةِ —যেমন- الدَّلِيلُ তথা প্রমাণ। অর্থঃ ‘সালাত কায়েম কর’—এ আয়াতটি সালাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল।

উল্লেখ্য, أَصْلُ শব্দটি যদিও প্রচলন ক্ষেত্রে উপযুক্ত চারটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে, কিন্তু যখন তাকে কোন ইলমের দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করা হয়, তখন চতুর্থ অর্থটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং أَصُولُ الْفِقْهِ-এর অর্থ হবে ‘ফিকহশাস্ত্রের প্রমাণাদি’।

ওলামায়ে কিরাম ইলমুল ফিকহের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

১. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী رحمته الله বলেছেন,

الْفِقْهُ مَعْقُولٌ مِّنْ مَّنْقُولٍ.

‘কুরআন ও হাদীসের নকলী ভাষ্য হতে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ফিকহ বলা হয়।’<sup>১</sup>

২. ইমাম আবু হানিফা رحمته الله বলেন,

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا.

‘কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মোপলব্ধি ফিকহ বলা হয়।’<sup>২</sup>

৩. আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী رحمته الله বলেন,

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.

<sup>১</sup> আস-সুয়ূতী, আল-হাওয়ায়ী লিল-ফতওয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪২

<sup>২</sup> আয-যারকাশী, আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ, খ. ১, পৃ. ৩৯


‘বিস্তারিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে উদঘাটিত শরীয়তের আমলসংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে ফিকহ বলে।’

৪. কারো মতে,

الْفَقْهُ هُوَ جَمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

‘ইসলামের বিধিবদ্ধ আইনসমূহের সমষ্টিই হলো ফিকহ।’

পদবি পদীয় সংজ্ঞা: أَصُولُ الْفَقْهِ শব্দদ্বয় একত্রিত করে যে বিদ্যার নামকরণ করা হয়েছে তার সংজ্ঞা দেয়াকে تَعْرِيفٌ لَقَبِيٌّ বলা হয়। ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন—

১. আল্লামা মোল্লা যিয়ুন  বলেছেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ إِبْتَاتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ.

‘যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিতিকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, সে শাস্ত্রকে أَصُولُ الْفَقْهِ বলে।’

২. মুসল্লম শ্বাহকার বলেন,

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِبْطَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ دَلَالِهَا.

‘উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়।’

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে,

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفَقْهِ.

‘এমন কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।’

**ফিকহশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়**

২. ও ১. الْأَدِلَّةُ -এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি। যথা—

১. كِتَابُ اللَّهِ. ২. كِتَابُ النَّبِيِّ. ৩. كِتَابُ الرِّسَالَةِ. ৪. كِتَابُ السُّنَنِ. ৫. كِتَابُ الْإِجْمَاعِ. ৬. كِتَابُ الْقِيَاسِ. ৭. كِتَابُ الرِّسَالَةِ. ৮. كِتَابُ السُّنَنِ. ৯. كِتَابُ الْإِجْمَاعِ. ১০. كِتَابُ الْقِيَاسِ.

**ফিকহশাস্ত্রের উদ্দেশ্য**

উসূলে ফিকহের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা।

## ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি

হিজরী দ্বিতীয় (অষ্টম খ্রিস্টাব্দ) শতাব্দীর প্রথম থেকেই উসূলে ফিকহের তাত্ত্বিক বিষয়ে চিন্তার সূত্রপাত হয়।<sup>১</sup> এ সময় হাদীস যাচাই বাছাই ও গ্রহণযোগ্যতার বিচার বিষয়ক শাস্ত্র উসূলে হাদীসের উদ্ভব হওয়ায় এর পাশাপাশি ফিকহ নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহন করে। এভাবে আসহাবুর রায় (ফিকহী মত)-এর প্রভেদ গড়ে ওঠে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি প্রমুখকে আসহাবুর রায় বলা হয় এবং রায় বিরোধীদেরকে আসহাবুল হাদীস বলা হয় তবে এ সময় ইরাকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহের সূচনা করেন। এদিকে মদিনায় ইমাম মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুশীলন শুরু করেন। এ দুই সিনিয়র ফকীহ মূলত উসূলে ফিকহের প্রথম দিকপাল। কিন্তু তাদের গবেষণায় উসূলে ফিকহ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি বলে মনে করা হয়। তাঁদের সময় পর্যন্ত আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় বা ফকীহগণের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যস্থরূপে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হি আবির্ভূত হন। তিনি শরীয়তের উৎসসমূহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালাকে জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে রূপদান করেন এবং যথাযথ নিয়ম ও শর্ত দ্বারা এগুলোর নির্বিচার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করেন।

ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উসূলুল ফিকহের প্রভাবে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাদের রায়সমূহ এর মূলনীতির আলোকে ঢেলে সাজান। এভাবে ফিকহ চর্চা, সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাকরণে পরিণত হয় উসূলে ফিকহ। তৃতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ইসলামী আইন অনুশীলনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে উসূলুল ফিকহ এক অপরিহার্য শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

ফিকহ ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ছিলেন উসূলে ফিকহ বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্ভাবক। তাঁরই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি ও মুহাম্মদ রহমতুল্লাহু আলায়হি أُصُولُ الْفِقْهِ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর আমলে উসূলে ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি তাঁর রিসালা ও কিতাবুল উম্ম كِتَابُ الْأُمِّ নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তাঁকে উসূলে ফিকহের প্রথম সার্থক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহের বিভিন্ন পরিভাষা; যেমন— أَلْعَامُ، الْأَجْتِهَادُ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ, الْإِسْتِخْسَانُ ও الْإِسْتِصْحَابُ ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। এসবের ওপর

<sup>১</sup> সহক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ২৩৬

ভিত্তি করে উসূলে ফিকহের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় এবং বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণীত হয়।

### ফিকহশাফের গ্রন্থাবলি

ফিকহশাফের উৎপত্তি, বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব, তাদের প্রদত্ত ফতোয়াসমূহ উসূলে ফিকহ বিজ্ঞানের যথাযথ ধারা-উপধারায় বিন্যাস, সমালোচনা ইত্যাদি পটভূমিতে উসূলে ফিকহের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আইন গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন, উদ্ভাবন ও সংগ্রহে উসূলে ফিকহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সূচনাপর্ব থেকে অদ্যবধি উসূলে ফিকহের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি. = ৭২৭-৮২০ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *রিসালা*।
২. ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়ায়নী (৪১৯-৪৭৮ হি. = ১০২৮-১০৮৫ খ্রি.)-এর *আল-ওয়াকাত ফী উসূলিল ফিকহ*।
৩. ফখরুল ইসলাম আবুল হাসান আল-বায়দাবী (৪০০-৪৮২ হি. = ১০১০-১০৮৯ খ্রি.)-এর *কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল*।
৪. সাদরুশ শরীয়া আল-আসগর আল-মাহবুবী (৫০০-৭৪৭ হি. = ১০০০-১৩৪৬)-এর *আত-তানকীহ ফী উসূলিল ফিকহ ও আত-তাওয়াহ ফী হাল্লি গাওয়ামিযিত তানকীহ*।
৫. তাজুদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি. = ১৩২৭-১৩৭০ খ্রি.)-এর *জামউল জাওয়ামী ফী উসূলিল ফিকহ*।
৬. মোল্লা খসরু (১০০০-৮৮৫ হি. = ১৪৮০ খ্রি.)-এর *মিরকাতুল ওয়ুসূল ইলা ইলমিল উসূল এবং মিরয়াতুল উসূল ফী শরহি মিরকাতিল ওয়ুসূল ইলা ইলমিল উসূল*।
৭. আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (১০০০-৭১০ হি. = ১০০০-১৩১০ খ্রি.)-এর *আল-মানার উসূলিদ দীন*।

### ফিকহশাফের মূলনীতিসমূহ

ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিসমূহ হলো, যেগুলোর ওপর শরয়ী বিধি-বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তা মূলত তিনটি। যথা- কিতাবুল্লাহ তথা আল কুরআন, ২. সুন্নাত তথা হাদীসে রাসূল ﷺ, ৩. ইজমায়ে উম্মাহ। অতঃপর উল্লিখিত মূলনীতিত্রয় হতে উদ্ভাবিত চতুর্থ মূলনীতি হলো, ৪. কিয়াস। বলা বাহুল্য উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয়ও এ মূলনীতি চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

এক. كِتَابُ اللَّهِ (কিতাবুল্লাহ)

১. الْكِتَابُ-এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল মানার গ্রন্থকার

আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী رحمته الله تعالى। তিনি বলেন,

أَمَّا الْكِتَابُ فَلَقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ الْمَكْتُوبُ فِي الْإِلْمِ مَصَاحِفُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

‘কিতাব হলো রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক পন্থায় বর্ণিত।’<sup>১</sup>

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رحمته الله تعالى তাঁর আল-কুরআনের মুখপত্র আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন গ্রন্থে বলেন,

أَمَّا الْكِتَابُ فَلَقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

মোটকথা الْكِتَابُ হলো আল কুরআন, এটা আল্লাহর সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন- আল্লাহর বাণী:

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

‘এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।’<sup>২</sup>

কিতাবুল্লাহর শ্রেণিবিভাগ: কিতাবুল্লাহকে চারটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণী আবার কতিপয় উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন-

- প্রথম শ্রেণিবিভাগ: আল কুরআনের শব্দ (صِيغَةً) এবং ভাষা (لُغَةً)-এর বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ। এটা চার প্রকার। যথা- ১. الْخَاصُّ (বিশেষ অর্থবোধক), ২. الْعَامُّ الْخَاصُّ (ব্যাপক অর্থবোধক), ৩. الْمُشْتَرَكُ الْخَاصُّ (একাধিক অর্থবোধক) ও ৪. الْمُؤَوَّلُ الْخَاصُّ (তাবীলকৃত অর্থবোধক)।
- দ্বিতীয় শ্রেণিবিভাগ: কুরআনী শব্দের অর্থ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হওয়ার বিবেচনায় শ্রেণিবিভাগ। এটাও চার প্রকার। যথা-

<sup>১</sup> আন-নাসাফী, আল-মানার ফী উলুমিল ফিকহ, পৃ. ২

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আ ৫৬:৮০ ও সূরা আল-হাক্বা ৬৯:৪৩

ক. অর্থ স্পষ্ট হওয়ার বিবেচনায়: যেমন- ১. الْخَاصُّ الظَّاهِرُ (স্পষ্ট), ২. النَّصُّ الْمَحْكَمُ الْخَاصُّ (অতি স্পষ্ট) ও ৩. الْخَاصُّ الْمُفَسَّرُ (সুস্পষ্ট), ৪. الْخَاصُّ الْمَجْمُلُ (সর্বাধিক স্পষ্ট)।

খ. অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার বিবেচনায়: যেমন- ১. الْخَفِيُّ, ২. الْمُشْكَلُ, ৩. الْمُشْتَبَاهُ ও ৪. الْمُجْمَلُ।

- তৃতীয় শ্রেণিবিভাগ: আল কুরআনের শব্দের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিবেচনায় শ্রেণিবিভাগ। এটাও চার প্রকার। যথা- ১. الْإِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ, ২. الْإِسْتِدْلَالُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ, ৩. الْإِسْتِدْلَالُ بِإِثْبَاتِ النَّصِّ, ৪. الْإِسْتِدْلَالُ بِدِلَالَةِ النَّصِّ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের প্রকাশিত ফিক ও আইনশাস্ত্র পরিচিত দেখুন।

দুই. سُنَّةُ الرَّسُولِ (সুন্নাতে রাসূল)

রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস তথা সুন্নাহ বলা হয়। তদ্রূপ সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির ওপরও সুন্নাহ শব্দটি প্রযোজ্য। অধিকাংশ আলিমের মতে, শরীয়তের আহকাম সাব্যস্ত হয় এমন কুরআনের আয়াত ৫ শত আর হাদীসের সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার)।

তিন. إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ (ইজমায়ে উম্মাত)

إِجْمَاعُ শব্দের অর্থ ঐকমত্য হওয়া ও সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদগণ কর্তৃক কোন قَوْلٍ অথবা فِعْلٍ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ বলা হয়। তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত শরীয়তের অকাট্য দলীল। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«لَنْ يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا»

‘আমার উম্মত ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না।’

চার. الْقِيَاسُ (কিয়াস)

১ আত-তাবারানী, আল-মুজাম্মুল কবীর, খ. ১২, পৃ. ৪৪৭, হাদীস: ১৩৬২৩, হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

اَلْقِيَاسُ শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুমান করা, নির্ধারণ করা ও তুলনা করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় কিয়াস হচ্ছে, ইল্লাত শাখাকে মূলের হুকুমের সাথে কোন শাখা মাসআলাকে মূল মাসয়ালার ওপর অনুমান করা। অর্থাৎ শাখার মধ্যে মূলের عِلَّة (কারণ) বিদ্যমান থাকার কারণে শাখাকে মূলের হুকুমের সাথে মিলিয়ে দেয়া। যেমন— মদ হারাম হওয়ার ওপর অনুমান করে সিদ্ধান্ত দেয়া যায় যে, গাঁজা সেবন করা হারাম। কেননা মদ হারাম হওয়ার عِلَّة হচ্ছে মাতাল হওয়া। যেহেতু গাঁজা সেবন করলেও ব্যক্তি মাতাল হয়ে যায় সেহেতু গাঁজা সেবন করা হারাম। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মদের হুরমাত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আর গাঁজার হুরমাত কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

## আসহাবুল হাদীস ও আসহাবুর রায়

পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের কাল থেকে দুটো ভিন্ন শ্রেণীর আলেমগণের ব্যাপারে এ পরিভাষা প্রচলিত আছে। তাঁদের এক শ্রেণীকে আসহাবুল হাদীস এবং অপর শ্রেণীকে আসহাবুর রায় বলা হয়। কোন কোন বিরুদ্ধপ্রায়ণ ব্যক্তি এ বিভিন্ণতাকে এমন ধুমধামের সাথে প্রচার করেছেন, যেন আসহাবুল হাদীস হলেন তারা, যাঁরা শুধু হাদীসের অনুসরণ করেন। যুক্তি ও বুদ্ধিকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে মান্য করেন না। আবার আসহাবুর রায় হলেন তারা যাঁরা নিছক কিয়াস ও বুদ্ধিরই অনুসরণ করেন এবং তার বিপরীতে হাদীস বর্জন করে চলেন। সাম্প্রতিক কালের কোন কোন প্রাচ্যবাদীও ডামাডোল পিটিয়ে ও ধারণাটা প্রচার করেন। একথাটা বাস্তবের সাথে সম্পূর্ণ অমিল। এ দু'শ্রেণী মৌলিকভাবে কোন বড় ধরনের মতপার্থক্য পোষণ করেন না। মূলত আসহাবুল হাদীস কিয়াস অস্বীকারকারী নন এবং আসহাবুর রায়ও হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করে না। বরং উভয় শ্রেণী এ বিষয়ের ওপর একমত যে, কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য কিয়াসের ওপর অগ্রগণ্য। আর যেখানে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান না হবে, সেখানে কিয়াস দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়া যেতে পারে।

প্রাথমিককালে এসব পরিভাষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু ছিল যে, হাদীসশাস্ত্র চর্চায় রত ব্যক্তিগণকে আসহাবুল হাদীস, আর ফিকহশাস্ত্র চর্চাকারীগণকে আসহাবুর রায় বলা হত। এরা দুটো সম্প্রদায় বা দুটো চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন না। বরং তা ছিলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুটো পৃথক পৃথক অনুষদ। মুহাদ্দিসীনকে আসহাবুল হাদীস এ ভিত্তিতে বলা হত যে, তাঁরা হাদীসের সংরক্ষণ ও বর্ণনার কাজকে নিজেদের সারাক্ষণের সঙ্গী বানিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি এতে ব্যয় করেন। হাদীস থেকে ইসলামী বিধি-বিধান উদ্ভাবন



করার প্রতি তাঁদের মনোযোগ ছিল। ফকীহগণকে আসহাবুর রায় এ ভিত্তিতে বলা হত যে, তাঁরা ইসলামী বিধি-বিধান উদ্ভাবনকে নিজেদের কর্মব্যস্ততায় পরিণত করেছিলেন। হাদীস গ্রন্থাবলি সংকলন এবং হাদীসের প্রচার-প্রসারের প্রতি তাঁদের অধিক মনোযোগের পরিবর্তে হাদীসগুলো থেকে উদ্ভাবনযোগ্য বিধি-বিধানের প্রচার প্রসারের প্রতি তাঁদের অধিক মনোযোগ ছিল। অতঃপর সেসব মনীষী বিধি-বিধান উদ্ভাবনে প্রচুর পরিমাণে কিয়াসের সহযোগিতা নিতেন। এ দৃষ্টিতে তাঁদেরকে আসহাবুর রায় বলা হত। সুতরাং এ হচ্ছে জ্ঞানের দুটো পৃথক শাখা, যেগুলোর মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোন বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব নেই।

সাধারণত একথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে যে, আসহাবুর রায় শুধু হানাফী মাযহাব অনুসারী এবং কুফাবাসীর উপাধি ছিল কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, এ উপাধিই সকল ফকীহের জন্যে ব্যবহৃত হত। যার দরুন ইবনে কুতায়বা রাহিমাহুল্লাহ আল-মাআরিফ গ্রন্থে ফকীহগণের আলোচনা আসহাবুর রায় শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আওয়ামী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ-এর মত মুহাদ্দিসগণকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল হারিস আল-খুশানী রাহিমাহুল্লাহ কুযাতুল কুরতুবা কিতাবে মালেকী মাযহাব অনুসারী আলেমগণের আলোচনা আসহাবুর রায় শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ হাফিয আবুল ওয়ালিদ আল-ফারযী আল-মালিকী রাহিমাহুল্লাহ তারীখু ওলামায়িল উন্দুলস গ্রন্থে মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের আলোচনায় তাঁদেরকে আসহাবুর রায় বলেছেন।

আল্লামা আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী আল-মালিকী রাহিমাহুল্লাহ মুওয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুনতাকে ফকীহদের সকলের জন্যে আসহাবুর রায় শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম হাফিয ইবনে আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ ও মালিকী মাযহাবের আলেমদের জন্যে এ শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এমনকি তিনি মুওয়াত্তা কিতাবের যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, তার নাম الْإِسْتِذْكَارُ فِي شَرْحِ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَنْصَارِ। এত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, আসহাবুর রায় উপাধিটি ফকীহগণের সবার জন্যেই ব্যবহৃত হত। তবে এটা ঠিক, পরবর্তীতে এ শব্দটি ধীরে ধীরে ইরাক ও কুফাবাসী ফকীহগণের জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

এরপর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। এর কারণ এ ছিল না যে, তিনি কিয়াস ও রায়কে কুরআন সুন্যাহর স্পষ্ট ভাষ্যের ওপর অগ্রগণ্য মনে করতেন। বরং অপরাপর আলেমদের তুলনায় কুফাবাসী বিশেষত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীগণ ইসলামী বিধি-বিধান উদ্ভাবনকে নিজেদের বিশেষ কর্মব্যস্ততায় পরিণত করে

নিয়েছিলেন। অন্যান্য মনীষীদের অবস্থা ছিল, নিত্যদিন যে মাসআলাগুলো তাঁদের সম্মুখে আসত, তাঁরা শুধু সেগুলো কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ভাবন করে যেতেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ নিত্যদিনের মাসআলার যতগুলো উদ্ভাবন করেই দায়িত্ব শেষ করতেন না। বরং যুক্তিগত দিক থেকে কোন মাসআলার যতগুলো দিক হওয়া সম্ভব ছিল, সে সবার বিধি-বিধানও তাঁরা নির্দিষ্ট করে দিতেন। এটা সুস্পষ্ট যে, এ কাজে ব্যাপক পরিসরে কিয়াসের ব্যবহার হয়েছিল। এজন্যে তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে আসহাবুর রায় উপাধি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর হানাফীদের জন্যে এটা কোন দোষেরও ছিল না। বরং তাঁদের জন্যে এটা গৌরবের কারণ ছিল। কেননা তাঁরাই প্রথম যথারীতি ফিকহশাস্ত্র সংকলন করেন। যার ফিকহী মাসআলার শাখা-প্রশাখাসহ সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৯০০০০।

যেহেতু আসহাবুর রায় শব্দটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসারীদের জন্যে ব্যবহৃত হত, সেহেতু হানাফী মাযহাব অনুসারীদের কোন কোন বিরোধী পক্ষে এ প্রচারণা চালানোর সুযোগ হাতে এসে গেল যে, হানাফীরা নুসুস কুরআন হাদীসের (স্পষ্ট ভাষ্যের) ওপর ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেন। এ প্রচারণার ফলে কোন কোন নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদও প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাদের মনে এ ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলো যে, হানাফীদের আহলুর রায় হওয়ার অর্থ, তাঁরা ব্যক্তিগত মতামতকে নুসুস তথা কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্যের ওপর অগ্রবর্তী মনে করেন। এর ফলে কোন কোন শিক্ষাবিদ থেকে হানাফী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মারাত্মক বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। অন্যথায় বাস্তব অবস্থা অতটুকু যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা হানাফী মতাবলম্বী শুধু মারফু হাদীসগুলোই নয়। বরং সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের ঐতিহ্যগুলোও নিজেদের কিয়াসের ওপর অগ্রগণ্য বলে অভিমত পোষণ করেন।

তাই শাফিয়ী মতাবলম্বী আলেম আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় কিতাব الْخَيْرَاتُ الْوَحْشَانُ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ-এ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, যাঁরাই হানাফী মতাবলম্বীগণকে আসহাবুর রায় আখ্যায়িত করেছেন, এতে কাউকে দোষারোপ করার কোন অভিসন্ধি তাঁদের ছিল না। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তাঁরা ইসলামী বিধি-বিধান তথা আইন-কানুন উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অতএব এর দ্বারা এ ফল বের করা বড়ই অজ্ঞতার কাজ হবে যে, ইমাম আযম রহিমাহুল্লাহ কিয়াসকে নসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। অথবা তিনি এবং তাঁর সাথীবৃন্দ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। অথবা তাঁদের কাছে হাদীসের বর্ণনাকারী অতি অল্প ছিল। এ জাতীয় সকল ধারণাই অজ্ঞতার নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে

তাঁর মর্যাদা বড় বড় মুহাদ্দিসের চেয়েও বহু উর্ধ্বে। কিন্তু যেহেতু হাদীস বর্ণনাকে তিনি নিজ কর্মব্যস্ততায় পরিণত করেননি, সে জন্যে হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থাবলিতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা স্বল্পই দেখতে পাওয়া যায়। অন্যথায় হাদীসশাস্ত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক একটি সর্বসমর্থিত বিষয়। উল্লেখ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম হাদীশাস্ত্রের ওপর তারতীব লিপিবদ্ধ করেছেন। যার ওপর ভিত্তি করে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের কিতাব সংকলন করেন এবং ইমাম শাফি'রী রাহিমাহুল্লাহ আর-রিসালা নামে প্রথম হাদীস ও উসূলশাস্ত্রের কিতাব লিখেছেন।

### ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কুফা এবং ইলমে হাদীস

সাহাবা ও তাবয়ীনের যুগে কুফা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং ভাণ্ডার ছিল। এ নগরী হযরত ওমর রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা যেহেতু নও মুসলিমদের আবাসস্থল ছিল, তাই তিনি এর অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের বিরাট সংখ্যক সদস্যকে তিনি এতে বসবাস করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার সর্বাধিক ইসলামী আইনজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ-কে সেখানে শিক্ষকরূপে পাঠান। কুফাবাসীর কাছে বার্তা প্রেরণ করে তিনি বললেন, ‘আমি আমার নিজের চেয়ে আবদুল্লাহ প্রসঙ্গে তোমাদেরকে অধিক প্রাধান্য দিলাম।’ হযরত হুযায়ফা রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, ‘গান্ধীর্ষে ও পথ চলায়, আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চাইতে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ অপর কেউ ছিলেন না।’

হযরত ওমর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি হচ্ছেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ এক ভাণ্ডার।’ যার দরশন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষ পর্যন্ত কুফাতেই অবস্থানরত ছিলেন। শহরটিকে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন এবং নবুওয়তের আলোকমালা প্রবলবেগে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখানে তিনি তাঁর ছাত্রদের এমন এক বিরাট দল তৈরি করেছিলেন, যাঁরা দিবারাত্র দীনি ইলম অর্জন ও পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর এরূপ ছাত্র সংখ্যা ৭৪ জন ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা কুফায় যে আলেম সমাজ তৈরি হয়েছিল, তাঁদের সংখ্যা আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী রাহিমাহুল্লাহ নসবুর রায়ী গ্রন্থের ভূমিকায় ৪ হাজার বলে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও ফকীহ সাহাবীগণের কেউ কেউ সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাহিমাহুল্লাহ, হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ, হযরত সালমান আল-ফারসী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাযী আল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনুল জুয রাযী আল্লাহু আনহু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আরো অনেক সাহাবী কুফায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি কুফাকে স্থায়ী বাসস্থানরূপে বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ইমাম আজলী এক হাজার ৫০০ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে যাঁরা অস্থায়ীভাবে কুফায় এসেছিলেন এবং পরে অন্যত্র চলে গেছেন, সেসব সাহাবী এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নন।

এত বিরাট সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এ নগরীতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কেমন হবে তা স্পষ্ট কথা। যার দরুন যখন হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু কুফাকে নিজ খিলাফতের রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন, তিনি তখন সেখানে দীনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, ‘আল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু-কে রহম করুন, তিনি এ জনপদকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।’ তিনি আরো বলেন, ‘ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু-এর শিষ্যরা এ উম্মতের প্রদীপতুল্য।’

হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু-এর শুভাগমনের ফলে কুফায় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তাঁর খ্যাতিও প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেননা তিনি স্বয়ং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে অতীব সুপরিচিত। একটি ঘটনা থেকে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অনুমান করা যেতে পারে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযী আল্লাহু আনহু-এর মত একজন আইনজ্ঞ সাহাবী নিজ ছাত্র হযরত আমর ইবনে মায়মুন রাযী আল্লাহু আনহু-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু থেকে ইলম হাসিল কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু-এর সাথে হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহুও মিলিত হলেন। এতে করে কুফা নগরীর ইলমী মর্যাদা অন্য নগরীর তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই হযরত মাসরূক ইবনে আজদা রাযী আল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি সাহাবীগণের মাঝে যাতায়াত করে দেখলাম, তাঁদের দীনি জ্ঞান ছয় ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। এরপর গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে দেখতে পেলাম, তাঁদের দীনি ইলম দু’জন ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে। তাঁরা হলেন হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু।’ হযরত মাসরূক রাযী আল্লাহু আনহু-এর এ উক্তি অনুযায়ী হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু সাহাবীগণের সম্মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। এ মহৎ ব্যক্তিত্ব কুফায় অবস্থান করতেন। অতএব, বলা যেতে পারে, কুফা নগরীতে সাহাবায়ে কেরামের ইলম পুঞ্জিভূত ছিল।

কুফা নগরীতে হাদীসশাস্ত্রের ব্যাপক প্রসারের ফল দাঁড়ায়, সেখানে প্রতি ঘরে ঘরে হাদীসশাস্ত্রের চর্চা ছিল। প্রতিটি পাড়া/মহল্লা ছিল হাদীসশাস্ত্রের

পাঠশালা। তাই তো আল্লামা আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুযী আল-মুহাদিসুল ফাযিলে হযরত আনাস ইবনে সীরীন আল-মুহাদিসুল ফাযিলে-এর নিম্নের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَتَيْتُ الْكُوفَةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ، وَأَرْبَعَمِائَةٍ قَدْ فَقَهُوْا».

‘আমি কুফায় এলাম। সেখানে চার হাজার ছাত্রকে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নরত দেখতে পেলাম। আর চারশত ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম তাঁরা ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করছে।’<sup>১</sup>

তা ছাড়া আল্লামা তাজুদ্দীন আস-সুবকী আল-মুহাদিসুল ফাযিলে তাবাকাতুশ শাফিয়াতুল কুবরা কিতাবে হাফিয় আবু বকর ইবনে দাউদ আল-মুহাদিসুল ফাযিলে-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,  
 دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَمَعِيَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ ثَلَاثِينَ مُدًّا بِاقِلَاءٍ، فَكُنْتُ أَكِلُ مِنْهُ مُدًّا، وَأَكْتُبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشْرَجِ أَلْفَ حَدِيثٍ، فَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ حَصَلَ مَعِيَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ.

‘আমি কুফায় পৌছলাম। আমার কাছে একটি দেবরহাম ছিল। আমি তা দিয়ে ত্রিশ মুদ (প্রতি মুদে প্রায় ১৫ ছটাক) লুবিয়া ক্রয় করলাম। প্রতিদিন এক মুদ করে খেতাম আর হযরত আশবাহর কাছ থেকে ১ হাজার হাদীস লিখতাম। এতে করে মাসখানিকের মধ্যেই ৩০ হাজার হাদীসের সংকলন তৈরি হয়ে গেল।’<sup>২</sup>

যদি শুধু বুখারী শরীফের মতো একটি কিতাবের সনদে আগত ব্যক্তিদের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে তাতে ৩০০ লোক বর্ণনাকারী পাওয়া যাবে, যারা কুফা নগরীর অধিবাসী। আর এ কারণেই ইমাম বুখারী আল-মুহাদিসুল ফাযিলে বারংবার কুফা ভ্রমণ করেছিলেন।

## ইমাম আবু হানিফা আল-মুহাদিসুল ফাযিলে ও ইলমে হাদীস

ইমাম আযম আবু হানিফা আল-মুহাদিসুল ফাযিলে এ কুফা নগরীতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল সে যুগে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের কেন্দ্র। তিনি এ নগরীতেই প্রতিপালিত হন। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলীর কাছেই দীনি জ্ঞান অর্জন করেন। ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে যেহেতু ইমাম আবু হানিফা আল-মুহাদিসুল ফাযিলে-এর বর্ণিত কোন হাদীস নেই, সেহেতু কোন কোন সন্ধীর্ণমনা ব্যক্তি মনে করে বসেছে, ইমাম আবু হানিফা আল-মুহাদিসুল ফাযিলে

<sup>১</sup> আর-রামাহুরমুযী, আল-মুহাদিসুল ফাযিলে বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী, পৃ. ৫৬০

<sup>২</sup> (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখে বগদাদ, খ. ১১, পৃ. ৫৬০; (খ) আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু এটা একেবারেই অজ্ঞতার নামাস্তর এবং এমন ভিত্তিহীন অপবাদ, যার সারবত্তা বলতে কিছু নেই। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ৬টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে শুধু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর নয়। বরং ইমাম শাফি'রী রাহিমাহুল্লাহ-এরও কোন হাদীস বর্ণিত নেই। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর বিশিষ্ট ওস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছ থেকেও অধিক হাদীস বর্ণিত নেই। শুধু তিন-চার জায়গায় 'বর্ণনা' এসেছে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনাও হাতেগোনা অল্প ক'টি মাত্র। তার কারণ এ নয় যে, এ সকল মনীষী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। এর কারণ হলো:

১. প্রথমত এ সকল মনীষী ফকীহ ছিলেন। তাঁদের আসল কর্মব্যস্ততা ছিল ইসলামী বিধি-বিধান ও যুগজিজ্ঞাসার সমাধান নিয়ে।
২. এসব মনীষীর সকলেই ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম। তাঁদের ছিল অগণিত ছাত্র ও অনুসারী।

সুতরাং ৬টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ সংকলকগণ ভেবেছেন, তাঁদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা তাঁদের ছিল অগণিত ছাত্রদের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবেই। অতএব তাঁরা সেসব ইলম সংরক্ষণ করেছিলেন, যেগুলো বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। অন্যথায় হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসমর্থিত ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কেননা তিনি সর্বসম্মতিক্রমে একজন মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। মুজতাহিদের শর্তাবলির মধ্যে এ শর্ত অবশ্যম্ভাবী যে, তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে পরিপূর্ণ পারদর্শী হতে হবে। এদিক থেকে যদি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর কোন শৈথিল্য থাকত, তা হলে তাঁকে কি করে মুজতাহিদরূপে বরণ করে নেয়া হলো? তাই হাদীসশাস্ত্রের অনেক বিরাট বিরাট আলেম তাঁর উন্নত মর্যাদার দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি করেছেন। সেগুলো যদি উদ্ধৃত করা হয় তাহলে একটি বিশালকায় গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনচরিত গ্রন্থে বিভিন্ন মহা মনীষীদের যেসব উক্তিগুলো দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকে কতিপয় বাণী এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রথম উক্তি হযরত মক্কী ইবনে ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর। তিনি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর সেই খ্যাতিমান শিক্ষক, যার কাছ থেকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবে সংকলিত সুলাসিয়াত (৩ বর্ণনাকারীবিশিষ্ট) হাদীসগুলোর অধিকাংশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ছাত্র। তাহযীবুত তাহযীব ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর এ উক্তি বর্ণিত আছে, 'তিনি (ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক কালের সবচাইতে বড় আলেম।'<sup>১</sup>

<sup>১</sup> ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪৫০, ক্র. ৮১৭

একথা স্পষ্ট, সেকালের ইলম শব্দটির প্রয়োগ হত হাদীসশাস্ত্রের ওপর। সুতরাং এ উক্তির অর্থ দাঁড়ায়, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি সমসাময়িক যুগে হাদীসশাস্ত্রের সর্বাধিক বড় আলেম ছিলেন।

দ্বিতীয় উক্তি বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعُ وَلَا أَعْقَلُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

‘আমি সহস্র প্রবীণ চেয়ে অধিক ফিকহবিদ, অধিক পরহেযগার কাউকে পাইনি। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি।’<sup>১</sup>

ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি *তায়কিরাতুল হফফাযে* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় নিজ সনদে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর সমসাময়িককালে কুফায় তাঁর চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান, অধিক পরহেযগার এবং অধিক ফিকহশাস্ত্রবিদ কেউ ছিলেন না।’

ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি *তায়কিরাতুল হফফাযে* কিতাবের ১৬০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, ‘নিঃসন্দেহে আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ছিলেন একজন ইমাম।’<sup>২</sup>

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর জ্ঞান কতটুকু ছিল, তার একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী ও শিষ্যবর্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলে। ইমাম হাফিয় জামাল উদ্দীন আল-মিযযী রহমতুল্লাহু আলায়হি *তাহযীবুল কামাল* গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ৭৪ জন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাফিয় জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রহমতুল্লাহু আলায়হি *তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফায* ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ওস্তাদবর্গের নামাগুলোও উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাবিদগণ জানেন, ইমাম হাফিয় জামাল উদ্দীন আল-মিযযী রহমতুল্লাহু আলায়হি কোন হাদীস বর্ণনাকারীর সকল ওস্তাদের নাম পুরো উল্লেখ করেন না। বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ অল্প কয়েকজনের নাম বর্ণনা করেন মাত্র।

এ কারণেই মোল্লা আলী কারী রহমতুল্লাহু আলায়হি *মুসনদে আবু হানিফার* ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ওস্তাদগণের সংখ্যা ৪ হাজার বলে বর্ণনা করেছেন এসব ওস্তাদ হচ্ছেন সে স্তরের, যে স্তর পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে কেউ লাভ করতে পারেননি। কেননা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ওস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ী। এর নিম্নে তাঁর কোন ওস্তাদ ছিলেন না।

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায*, খ. ১, পৃ. ১২৭, ক্র. ১৬৩

<sup>২</sup> আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায*, খ. ১, পৃ. ১২৭, ক্র. ১৬৩

হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি

সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর পৌত্র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমার পিতামহ নুমান হিজরী ৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, আমার প্রতিমহ সাবিত তাঁকে নিয়ে যখন হযরত আলী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কাছে নিয়ে যান তখন তিনি (আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি) ছিলেন ছোট। তখন আলী রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরের জন্য দুআ করেছিলেন।

ইমাম ইবনে হাজার আল-হায়সমী আশ-শাফিয়ী আল-খায়রাতুল হাসানের গ্রন্থকার ইমাম আবু হানিফা আন-নুমান রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর জীবন ও কর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি বহু সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়ত করেন। তাঁদের সংখ্যা হিসেব করেছেন ১৭ জন। তাঁরা হলেন,

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক রহমতুল্লাহি আলায়হি,
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানী রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস ইবনে জায' আয-যুবাইদী রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৬. হযরত ওসায়িলা ইবনে আল-আসকা রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৭. হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৮. হযরত আবু আত-তুফাইল রহমতুল্লাহি আলায়হি,
৯. হযরত আমের ইবনে ওসায়িলা রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১০. হযরত আয়িশা বিনতে হাদরাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১২. হযরত আস-সায়িব ইবনে খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদ রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১৩. হযরত আস-সায়িব ইবনে ইয়াযিদ ইবন সা'দ রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামুরা রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১৫. হযরত মাহমুদ ইবনুর রাবী রহমতুল্লাহি আলায়হি,
১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর রহমতুল্লাহি আলায়হি ও
১৭. হযরত আবু উমামা রহমতুল্লাহি আলায়হি।

হাদীস বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি

১. হযরত আনাস ইবন মালিক রহমতুল্লাহি আলায়হি, অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর দেখা পেয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,



«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

‘প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন ফরয।’<sup>১</sup>

এই হাদীসটির আরেকটি সনদও রয়েছে।

২. ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগ্যে একটি সন্তানও পাইনি। আমার একটি সন্তানও হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّ أَنْتَ عَنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ يَرْزُقُ اللَّهُ بِهَا الْوَلَدَ».

‘তুমি বেশি বেশি সদকা করা আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে কোথায় পড়ে আছো? এর মাধ্যমেই তো আল্লাহ তাআলা সন্তানের রিয়ক দিয়ে থাকেন।’<sup>২</sup>

সংক্ষিপ্ততার দরুন এখানে নমুনাস্বরূপ দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, আল্লামা আস-সুবকী প্রণীত ইসলামী শরীয়াত প্রবর্তনের ইতিহাস গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, কিছু লোক ধারণা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি হাদীসের ক্ষেত্রে স্বল্পজ্ঞানী ছিলেন, এটা একটা ভিত্তিহীন ও প্রত্যাখ্যাত কথা। কারণ তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো, তিনি একাই ২১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন, এ সংখ্যা সেসব হাদীসের বাইরে যা তিনি অন্যান্য ইমামদের সাথে বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেছেন, তার একটি হাদীস সংকলন রয়েছে যাতে শুধু সালাতের উপরেই ১১৮টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহি বর্ণিত হাদীসমূহ

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যার কিছু হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে আবু হানিফা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নিচে সংক্ষিপ্তাকারে সেই সব কিতাবের তালিকা দেওয়া হলো:

১. সহীহ কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি-এর রিওয়ায়ত: ইমাম ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহি তাঁর সহীহ সংকলনে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি-এর রিওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনে খুয়ায়মা রহমতুল্লাহি ও তাঁর সহীহ ইবনে খুয়ায়মায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি-এর রিওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন।
২. সুনান কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি-এর রিওয়ায়ত: ইমাম তিরমিযী রহমতুল্লাহি-এর সুনানে তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী রহমতুল্লাহি-এর আস-সুনানুল কুবরা ও

<sup>১</sup> আবু নুআইম আল-আসবাহানী, মুসনদ ইমাম আবী হানিফা, পৃ. ২৪

<sup>২</sup> ইবনে খসর, মুসনদুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানিফা, খ. ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১১৮

সুনানুদ দারাকুতনীতে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।  
এভাবে ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর সুনানুল কুবরায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।

৩. বিভিন্ন মুসনদে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত: মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনদে আবু ইয়লা ও মুসনদুশ শিহাবে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে। একইভাবে মুসনদ সুফী ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এও ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।
৪. ইমাম তাহাবীর বিভিন্ন মুসনদে আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত: ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর শারহু মাআনিয়াল আসার ও শারহু মুশকিলুল আসার গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি বর্ণিত হাদীস রয়েছে।
৫. ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইনে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি বর্ণিত হাদীস রয়েছে।
৬. ইমাম তাবারানী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর তিনটি মু'জাম: আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত ও আল-মু'জামুস সগীরে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে।
৭. ইমাম আল-হাইসামী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মাজমাউয যাওয়ায়িদে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।
৮. হাদীসের মুসান্নাফসমূহে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত: মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও মুসান্নাফে আবদুর রায়যাকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে। একইভাবে ইমাম আবু বকর আল-জাসাসাস রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আহকামুল কুরআন গ্রন্থেও ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত আছে।
৯. ফকীহ ও উসুলী মুহাদ্দিসগণের কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত: ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কিতাবুল উম্ম, ইমাম আস-সারাক্সী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আল-মাবসূত, ইমাম ইবনে হাযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আল-মুহাল্লা বিল আসার ও আবদুল আযীয আল বুখারী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কাশফুল আসরার গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।
১০. ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর বর্ণিত হাদীস: খাতীব আল-বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত আছে।
১১. বিভিন্ন তাসাওউফের গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর রিওয়ায়ত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কিতাবুয যুহদ, ইমাম তাম্মাম আর-রাযী

আল-আলয়াহি-এর কিতাবুল ফাওয়ায়িদ, ইমাম ইবনুল মারযুবান আল-আলয়াহি-এর যাম্মুয সুকফালা ও কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাসানীতে ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।

১২. আল-আজযাউল হাদীসিয়ায় ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর বর্ণিত হাদীস: হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-আলয়াহি-এর গ্রন্থে, মান কাযাবা আলাইয়া হাদীসটি বিভিন্ন সূত্র বিভিন্ন গ্রন্থে; কিতাবুস সুন্নাহ, কিতাবুল ইমাতা বিল আরবাস্টিন গ্রন্থে ও ইমাম ইবনে হাইয়ান আল-ইসপাহানী আল-আলয়াহি-এর কিতাবুল জুয, জুযু আলফ দীনার, কিতাবুল ফাওয়ায়িদ, হাদীসে খায়সামা, কিতাবু মালীখাহি ইবনুল হাওব, কিতাবুল আমালী আল-মুতলাকা, কিতাবুল ইতিকাদ, কিতাবুল আযামা, মাজলিসু ইমলা ফী রুইয়াতিল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা প্রমুখ গ্রন্থগুলোতে ইমামে আযম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর রিওয়ায়ত রয়েছে।

এভাবে মহান আল্লাহর দর্শন ও আনুযাঙ্গিক প্রসঙ্গ সংবলিত কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর হাদীস রিওয়ায়ত রয়েছে। যেমন- কিতাবু জুযি ইবনি আমশালিক, কিতাব নসীহাতি আহলিল হাদীস, আল-উজালা ফিল আহাদীসিল মুসালসালা ও কিতাব ওয়াসায়াল ওলামা ইত্যাদি। এ হলো সংক্ষিপ্ত তালিকা অর্থাৎ যেসব কিতাবের কোন কোনটিতে এক দুইটি বা কোন কোনটি ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর বর্ণিত একাধিক হাদীস পাওয়া যায়। আমাদের এ গবেষণার ফল সংক্ষেপে আবার তুলে ধরছি: তিনি বর্ণনা করেছেন মোট ৩৭১টি হাদীস। এর মধ্যে মারফু হচ্ছে ১৪৬টি হাদীস। মওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন ৫৮টি, আসার হাদীসের সংখ্যা ১৬৮।

আসার বলা হয় তাবেয়ীগণের বাণী। এক কথায় তিনি ছিলেন মধ্যম পরিমাণের হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি অধিক রিওয়ায়তকারী নন (যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের অধিক)। আবার তিনি স্বল্পহাদীস বর্ণনাকারীও নন (যাদের বর্ণিত হাদীস একশতের কম)। তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর সেসব হাদীস ও আসার বর্ণনা করেছেন, যার ওপর আমল করা হয়। এর বাইরে তিনি হাদীস বর্ণনা করেননি। অতএব উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আবু হানিফা আল-আলয়াহি-এর ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র হচ্ছে হাদীসভিত্তিক ফিকহ। কারণ তিনি আকল খাটাবার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়াতের কি প্রামাণ্য দলীল আছে তার ওপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবু হানিফার আল-আলয়াহি-এর ক্ষেত্রে সেই হাদীসটি একদম মিলে যায়, যা তিনি তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল-আলয়াহি হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল

আল-আলয়াহি বলেছেন,

”رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ سَامِعٍ“.

‘আল্লাহ তঁকে দয়া করুন, যে আমার কোন বাণী শোনে তা যেমন শুনেছে তেমনি অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছে। কারণ অনেক ব্যক্তি আছেন যারা হাদীসটি পাওয়ার পর আমার থেকে সরাসরি শ্রোতা থেকেও বেশি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।’<sup>১</sup>

সুতরাং একদিকে হাদীসের বর্ণনা অপরদিকে হাদীসের বুঝ, প্রজ্ঞা বা ফিকহ। যিনি হাদীসের মর্ম বুঝেছেন তিনিই হলেন উত্তম ধারক, উত্তম সমঝদার। তিনিই তো এর জ্ঞান ও গূঢ় অর্থের গভীরে ডুব দিতে পারেন। তিনিই কুরআন-সুন্নাহর প্রামাণ্য বিষয়টি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারেন। আর আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন তাদের অন্যতম।

**হাদীসবিশারদদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি**

ইমাম আবু আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মতো জ্ঞানী সম্মানিত ও মুত্তাকী আমি আর কাউকে দেখিনি। এ উক্তিটি হলো প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি যে কত বড় আলেম বুয়ুর্গ ও ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন তা তার সমসাময়িক বড় বড় নক্ষত্রের মুখের বাণী দ্বারাই বোঝা যায়। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ফিকাহর কলিগুলো উন্মোচন করে কুরআন-হাদীসের আলোকে সেখান থেকে সুপ্ত সুগন্ধি বের করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন অতিজ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না। বিশেষভাবে হুকুমত থেকে। কারণ এতে হয়ত তাঁর দীনের ওপর চলার ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে। অথচ তাঁর সময়টা এমন একটা সময় ছিল, যখন মুসলিম জাহানের শাসকগণ প্রতিভাবান আলেম, মুহাদ্দিস ও জ্ঞানপিপাসুদের কদর করতেন, দেশ ও জাতিকে আল্লাহ ও রাসূলের রাস্তা চিনিতে দিতে ওলামায়ে কেরাম যে ভূমিকা পালন করতেন সেটিকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখতেই তখনকার হুকুমত সকল আলেমদের যে আর্থিক ব্যবস্থা করতেন তাতে তাদের সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা হয়ে যেত, তাঁদের অন্য কোনো উপার্জনের পথ খুঁজতে হত না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন এর ব্যতিক্রম, তিনি নিজের হাতকে সবসময় উপরে রাখতে চেষ্টা করতেন, তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ তাকওয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত।

<sup>১</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৭, পৃ. ২২১, হাদীস: ৪১৫৭; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৬৫৭; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৭১, হাদীস: ৬৮; (ঘ) আত-তবারানী, *আল-মু'জামুল সগীর*, খ. ২, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ১৬০৯

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ইমামদের মধ্যে একমাত্র তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ফিকাহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে, তিনি ইমাম ইবরাহীম আন-নাখ্বী থেকে, তিনি হযরত আলকামা রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহমতুল্লাহু আলায়হি, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমতুল্লাহু আলায়হি, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রহমতুল্লাহু আলায়হি ও আম্মাজান হযরত আয়েশা রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে। আর এ মহান সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইসলামী বিধিবিধান বুঝে নিয়েছিলেন। আর সাহাবারা যা বুঝেছেন তার মর্মবাণী ভালো করে বুঝেছেন তাবয়ীগণ, সে সাথে ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি।

ইমাম আবু হানিফার রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর প্রজ্ঞা ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার ছড়ানো ফিকহের ভাণ্ডার থেকে পরবর্তীরা রসদ সংগ্রহ করে ইসলামী যিন্দেগির পথকে সুগম করেছেন। কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর প্রতিটি মূলনীতিই ছিল কুরআন-হাদীসভিত্তিক। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি সহজে অনেকে আয়ত্বে আনতে পারেনা। ফলে অনেকের বুঝতে সমস্যা হয়, কিন্তু যখন গভীর নজরে দেখে তখন সবাই মানতে রাজী হয় যে তার প্রতিটি মূলনীতিই কুরআন ও হাদীসনির্ভর।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ব্যাপারে হাদীস ব্যুৎপত্তি স্বল্পতার যে অভিযোগ উঠে অনেকে প্রশ্ন করে যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর সনদ প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে আসেনি কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর নিজ হাতে লিখা হাদীসের কিতাব রয়েছে এবং ফিকহের কিতাবও রয়েছে এবং সেসব কিতাব ওই সময় লিখিত যে সময় লিখিত কিতাবের গুরুত্ব প্রচলন ছিল। আবার ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর সনদ কুতুবে সিভার ভেতরে নেই বলেই যে তিনি হাদীস যানতেন না তা বলা মূর্থতা ছাড়া আর কিছুই না। যেহেতু সোয়া লক্ষ সাহাবী থেকে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ সাহাবীর হাদীস বর্ণনা অধিক হারে আছে, আর কিছুসংখ্যক সাহাবীর হাদীস রিওয়ায়ত বিষয়নির্ভর বর্ণিত, এ ছাড়া হাজারো সাহাবী থেকে কোনো ধরনের হাদীস রিওয়ায়ত নেই, তাই বলে কি তাদের ক্ষেত্রে বলা যাবে তারা হাদীস জানতেন না? অথচ তাঁরা হলেন আল্লাহর নবীর সাহাবী!

**ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর তাবেয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ**

সাহাবীগণের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর তাবেয়ী হওয়া একটি স্বীকৃত এবং অনস্বীকার্য বাস্তবতা। ইমাম হাফয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হি বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর জন্ম ৮০

হিজরী সালে। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাঃ কুফায় বর্তমান ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রাঃ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেননি, একথা একেবারে অসম্ভব। তা ছাড়া ইমাম ইবনে সা'দ রাঃ তাবাকাতুল কুবরায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রাঃ তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফায় কতক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যেসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইমাম আবু হানিফা রাঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাঃ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসির ইবনে জুযয়য যাবীদী রাঃ ও হযরত আয়িশা বিনতে আযরাদ রাঃ সাহাবীগণ থেকে একাধিক বর্ণনা শুনেছেন।<sup>১</sup>

ইমাম হাফিয আবু মা'শার আবদুল করীম ইবনে আবদুস সামাদ আত-তাবারী রাঃ এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। এতে তিনি ইমাম আবু হানিফা রাঃ-এর সেসব বর্ণনা সংকলন করেছেন, যেগুলো তিনি সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুনেছেন। উক্ত গ্রন্থে অন্যান্য সাহাবী ছাড়াও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ, হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাঃ-এর কাছ থেকেও ইমাম আবু হানিফা রাঃ-এর হাদীস শ্রবণ করার বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে।

ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রাঃ তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফায় হাফিয আবু মা'শার রাঃ-এর সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ রাঃ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

‘ইমাম আবু হানিফা রাঃ আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাঃ বলেছেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইলম অর্জন করা ফরয।’<sup>২</sup>

এ বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রাঃ বলেন, এটি সহীহের সমপর্যায়ের। ইমাম হাফিয জামাল উদ্দীন আল-মিযযী

<sup>১</sup> আস-সুযুতী, তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফা, পৃ. ১৩

<sup>২</sup> আস-সুযুতী, তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফা, পৃ. ১৬

আলোয়াহি-এর মন্তব্য হচ্ছে, এ বর্ণনা বহুবিধ সূত্রের ভিত্তিতে হাসান হাদীসের স্তরে এসে পড়েছে। ইমাম আবু হানিফা আলোয়াহি-এর তাবেয়ী হওয়াটা বিশেষজ্ঞদের নিকট স্বীকৃত। কেননা ইমাম ইবনে সা'দ আলোয়াহি তাবাকাতুল কুবরায়, হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী আলোয়াহি তায়কিরাতুল হুফফায়ে ইমাম হাফিয় ইবনে হাজার আল-আসকলানী আলোয়াহি-এর উক্তি অনুযায়ী এক প্রশ্নের জবাবে, হাফিয় জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী আলোয়াহি, হাফিয় জামাল উদ্দীন আল-মিযযী আলোয়াহি তায়ীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজালে, আল্লামা কাসতালানী আলোয়াহি ইরশাদুস সারী ফী শরহিল বুখারীতে, আল্লামা নববী আলোয়াহি তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাতে, হাফিয় জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী আলোয়াহি তাবযীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফায় গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা আলোয়াহি-এর তাবেয়ী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

### ইমাম আবু হানিফা আলোয়াহি-এর জ্যেষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলী

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা আলোয়াহি-এর বিশেষ শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সেসব মহৎ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তাবেয়ীনের যুগে যাঁদেরকে হাদীসশাস্ত্রের স্তম্ভ মনে করা হয়। তাঁদের কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ইমাম আযম আলোয়াহি আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী আলোয়াহি থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী আলোয়াহি লিখেন, ‘তিনি আবু হানিফা আলোয়াহি-এর সর্বজ্যেষ্ঠ শিক্ষক।’<sup>১</sup>

আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী আলোয়াহি ৫০০ সাহাবী থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তির অবস্থা ছিল, তিনি কখনো কোন হাদীস লিখে মুখস্থ করেননি। তিনি প্রায়শ বলতেন, ‘আমার কবিতার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তা সত্ত্বেও যদি ইচ্ছা করি, তা হলে এক মাস যাবত কবিতা আবৃত্তি করে যেতে পারব এবং পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।’

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধসমূহের আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাঁর কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী আলোয়াহি-এর আলোচনা শুনে তিনি বললেন, ‘আমি-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সম্পর্কে আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী আলোয়াহি-এর ইলম আমার চেয়ে অধিক।’

খতীবে বাগদাদী আলোয়াহি হযরত আলী ইবনুল মাদীনী আলোয়াহি-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর ইলমসমূহ আলকামা,

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৬৩, ক্র. ৭৬

আসওয়াদ, হারিস, আমর ও উবায়দা ইবনে কাইস রাঃ-এর ওপর গিয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে। আর এদের ইলম দু'ব্যক্তির মধ্যে একত্র হয়েছে। তাঁদের একজন হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী রাঃ আর অপরজন আমির ইবনে শারাহীল আশ-শাবী রাঃ। এ দু'জনই ইমাম আবু হানিফা রাঃ-এর সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন।

ইমাম আযম রাঃ-এর অপর বিশিষ্ট শিক্ষক হচ্ছে হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান রাঃ। যাকে সর্বসম্মতিক্রমে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম মেনে নেয়া হয়েছে। তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর ইলমের সংরক্ষণকারী মনে করা হত। *সহীহ মুসলিম*, *সুনানে আবু দাউদ* ও *জামি তিরমিযী*তে তাঁর বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি হযরত আনাস রাঃ, হযরত যায়দ ইবনে আওহাব রাঃ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রাঃ, ইকরামা রাঃ, আবু ওয়ায়িল রাঃ, ইবরাহীম আন-নাখয়ী রাঃ এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাঃ-থেকে ইলম অর্জন করেন। ইমাম আবু হানিফা রাঃ হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান রাঃ-এর কাছ থেকে ২ হাজারের মতো হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁকে এতই সম্মান করতেন যে, কখনো তাঁর গৃহের দিকে পা বিস্তৃত করে শয়ন করতেন না।

ইমাম আযম রাঃ-এর তৃতীয় বিশিষ্ট শিক্ষক হচ্ছেন আবু ইসহাক সাবীযী রাঃ, যিনি আটত্রিশ জন সম্মানিত সাহাবী থেকে ইলম শিক্ষা করেন। আর আবু দাউদ তাযালেসী রাঃ-এর উক্তি অনুযায়ী তিনি “ইবনে মাসউদ ও আলী রাঃ-এর হাদীস সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন।” তিনি ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থেরও একজন বর্ণনাকারী।

তাঁদের ব্যতীত ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাঃ-এর সম্মানিত ওস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন অনেক সুখ্যাতিসম্পন্ন তাবেয়ী এবং উম্মতে মুহাম্মদীর শীর্ষ ব্যক্তিগণ। যেমন- ইবরাহীম আন-নাখয়ী রাঃ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রাঃ, কাতাদাহ রাঃ, নাফি' রাঃ, তাউস ইবনে কাইসান রাঃ, ইকরামা রাঃ, আতা ইবনে আবী রাবাহ রাঃ, আমর ইবনে দীনার রাঃ, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাঃ, ইমাম হাসান আল-বসরী রাঃ এবং ইমাম শায়বান সুলাইমান আল-আ'মশ রাঃ। আল্লাহ পাক তাঁদের সবার প্রতি রহম করুন।

**ইমাম আবু হানিফা রাঃ-এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শিষ্যবৃন্দ**

এখানে ইমাম আ'যম রাঃ-এর কতিপয় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন শিষ্যবৃন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এ তালিকায়ও হাদীসশাস্ত্রের বড় বড় ইমামদের নাম পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাঃ। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাঃ-এর উক্তি, ‘আল্লাহ তা'আলা যদি আবু হানিফা রাঃ ও সুফিয়ান আস-সাওরী রাঃ দ্বারা আমাকে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি সাধারণ লোকদের মত হয়ে যেতাম।’



তা ছাড়া জারাহ ও তা'দীলের প্রখ্যাত ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর শিষ্য। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ লিখেছেন, 'ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি অনুসারেই তিনি ফতোয়া দিতেন।' ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রাহিমাহুল্লাহ তাহযীব গ্রন্থে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, 'আমরা তাঁর (ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর) অধিকাংশ উক্তিই গ্রহণ করে নিয়েছি।'।

অপরদিকে আবদুল কাহির আল-কুরাশী রাহিমাহুল্লাহ আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়া ফী তাবাকাতিল হানাফিয়া এবং মুওয়াফফাক আল-মক্কী রাহিমাহুল্লাহ মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

وَاللّٰهُ جَالِسُنَا أَبَا حَنِيفَةَ وَسَمِعْنَا مِنْهُ وَكُنْتُ وَاللّٰهِ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَتَّقِي  
اللّٰهَ .

'আল্লাহর শপথ! আমরা আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গ লাভ করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে (হাদীস) শ্রবণ করেছি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখনই তাঁর দিকে তাকিয়েছি, তখনই তাঁর চেহারাকে মহা প্রতাপশালী আল্লাহর ভয় রয়েছে এমন দেখতে পেয়েছি।'।<sup>১</sup>

ইমাম শাফিযী রাহিমাহুল্লাহ-এর বিশিষ্ট ওস্তাদ হযরত ওকী' ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর শিষ্য। তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে ৯০০ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহিমাহুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'তিনিও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন।'।<sup>২</sup>

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ-এর অভিমতের ওপর তাঁর ফতোয়া দেয়া সাধারণ একজন মাযহাব অনুসারীর মতো ছিল না। বরং মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের মতো ছিল। যেভাবে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ কোন কোন মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে মতানৈক্য পোষণ করতেন। তদ্রূপ কোন কোন মাসআলায় ইমাম ওকী' রাহিমাহুল্লাহও

<sup>১</sup> (ক) আবদুল কাদির আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়া ফী তাবাকাতিল হানাফিয়া, খ. ২, পৃ. ২১২, ক্র. ৬৬৬; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখে বগদাদ, খ. ১৫, পৃ. ৪৭৪; (গ) আল-মুওয়াফফাকুল মক্কী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খ. ১, পৃ. ১৯৫

<sup>২</sup> ইবনে আবদুল বার, জামিউ বয়ানি ইলমি ওয়া ফযলিহি, খ. ২, পৃ. ১০৮২, ক্র. ২১০৯

মতানৈক্য পোষণ করতেন। যেমন হজ্জের জন্যে প্রেরিত উট চিহ্নিতকরণের মাসআলায় এমনটাই হয়েছে।

এ ছাড়াও প্রখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণের মধ্য থেকে মক্কী ইবনে ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন রাহিমাহুল্লাহ, হাফস ইবনে গিয়াস আন-নাখয়ী রাহিমাহুল্লাহ, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়দা রাহিমাহুল্লাহ, মিসআর ইবনে কুদাম রাহিমাহুল্লাহ, আবু আসেম আন-নাবীল রাহিমাহুল্লাহ, কাসেম ইবনে মা'আন রাহিমাহুল্লাহ, আলী ইবনে আলমিসহার রাহিমাহুল্লাহ, ফযল ইবনে দাকীন রাহিমাহুল্লাহ, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের মতো মহাসম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এর সম্মুখে ছাত্র হয়ে উপবেশন করেছিলেন। যে মুহাদ্দিসের ওস্তাদমণ্ডলী ও শিষ্যবৃন্দের মধ্যে এত উঁচু স্তরের মহান ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান, সে মুহাদ্দিস হাদীসশাস্ত্রবিদ সম্পর্কে এরূপ বলা যে, হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উন্নত অবস্থান ছিল না, বিরাট অন্যায়া ও বে-আদবির শামিল।

ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থাবলিতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর হাদীস সংরক্ষণ সম্পর্কে বড়ই চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলি বর্ণিত রয়েছে। নমুনাস্বরূপ এখানে দুটো ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

১. মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ মানাকিবুল ইমামিল আ'যমে উদ্ধৃত করেছেন, একদিন এক মজলিসে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। কেউ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়ে দেন। ইমাম আ'মাশ উত্তর শুনে বললেন, আপনি এটা কোথা থেকে পেলেন? ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিলেন, আপনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। আপনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আয়াস রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি আবু মাসউদ আল-আনসারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। আর আপনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ওয়ায়িল রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। আবার আপনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু মিজলায রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। আর আপনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি জাবির রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। এতে ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ স্তম্ভিত হয়ে বলেন, যথেষ্ট হয়েছে। আমি একশ দিনে তোমার কাছে যা বর্ণনা করেছি, তুমি আমার কাছে তা এক মুহূর্তে বর্ণনা করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

بِمَعَشَرَ الْفُقَهَاءِ! أَنْتُمْ الْأَطْيَاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ، وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ! أَخَذْتُ بِكُلِّ الطَّرْفَيْنِ.

‘হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরা চিকিৎসক সমাজ আর আমরা হলাম হাসপাতাল। আর হে আবু হানিফা! তুমি উভয় দিকই পেয়ে গেছ।’

২. দ্বিতীয় ঘটনা হলো ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যখন কোন শরয়ী মাসআলা বলতেন, তখন আমি কূফার সকল হাদীস শিক্ষাবিদেদের কাছে যেতাম। তাঁদের কাছ থেকে সে হাদীসগুলো সংগ্রহ করে নিতাম যা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্তির সমর্থন করত এবং এ ভাবনায় ইমাম আ'যম রাহিমাহুল্লাহ-কে সেগুলো শোনাতাম যে, তিনি সেগুলো শুনে খুশি হবেন। কিন্তু আমি যখন হাদীস শুনিতে অবসর হতাম, তখন ইমাম সাহের রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, এগুলোর মধ্য থেকে অমুক হাদীসে অমুক ত্রুটি রয়েছে, অমুক হাদীসে অমুক বর্ণনাকারী দুর্বল। তা ছাড়া অমুক কারণ পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু সেটি প্রমাণ্য নয়। তারপর ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি কূফাবাসীদের ইলম সম্পর্কে জ্ঞান রাখি।

## ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবুল আসার

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষামূলক অবদানসমূহের মধ্য থেকে কিতাবুল আসার গ্রন্থখানি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উন্নত আসনের সাক্ষ্য বহন করেছে। এ কিতাবখানি ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যায়সমূহের ধারায় বিন্যস্ত হাদীসের সর্বপ্রথম কিতাব। ইমাম হাফিয় জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী রাহিমাহুল্লাহ তাবরীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফা গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর এ মর্যাদাটুকু কম নয় যে, তিনি সর্বপ্রথম ফিকহ বিষয়ক অধ্যয়নসমূহের ধারায় বিন্যস্ত হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেছেন। এ মর্যাদা অপর কেউ লাভ করতে পারেননি। ইমাম আ'যম রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবুল আসার গ্রন্থটি মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকের উৎস গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। কেননা ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা ও সাহিবায়হি গ্রন্থে কাযী আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম রাহিমাহুল্লাহ-এর আখবারে আবী হানিফা কিতাবের বরাত দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল আযীয আদ-দারাতুয়ায়দী রাহিমাহুল্লাহ-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হতেন। এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইমাম আবু হানিফা

<sup>১</sup> আবদুল কাদির আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানিফা, খ. ২, পৃ. ৪৮৫, ক্র. ৬৬৬

আল-আলায়হি-এর কিতাবুল আসারের স্থান ইমাম মালিক ইবনে আনাস আল-আলায়হি-এর মুওয়াত্তার তুলনায় এরূপ, সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের তুলনায় মুওয়াত্তার স্থান যেরূপ। হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থাবলির মতো কিতাবুল আসার গ্রন্থখানিরও অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ৪জন হলেন: ১. ইমাম আবু ইউসুফ আল-আলায়হি, ২. ইমাম মুহাম্মদ আল-আলায়হি, ৩. ইমাম যুফার আল-আলায়হি ও ৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ আল-আলায়হি।

ইমাম বুখারী আল-আলায়হি যেমনিভাবে নিজ সহীহ গ্রন্থখানি ৬ লাখ হাদীস থেকে নির্বাচন করত বিন্যস্ত করেছেন, অনুরূপ ইমাম আবু হানিফা আল-আলায়হি ও কিতাবুল আসার গ্রন্থখানি অনেক অনেক হাদীস থেকে নির্বাচন করত বিন্যস্ত করেছেন। এরপর যেহেতু ইমাম আবু হানিফা আল-আলায়হি ইমাম বুখারী আল-আলায়হি প্রমুখের চেয়ে অগ্রজ এবং তাঁর সময়কালে হাদীসের সনদ ও বর্ণনাধারায় এত আধিক্য ও ব্যাপকত সৃষ্টি হয়নি, এ জন্যে ইমাম আযম আল-আলায়হি-এর এ নির্বাচন ৪০ হাজার হাদীসের মধ্য থেকে করা হয়েছে। যেমন- আল্লামা মুওয়াফফাক আল-মক্কী আল-আলায়হি মানাকিবুল ইমামিল আযম গ্রন্থে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আয-যারানযারী আল-আলায়হি-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ‘আবু হানিফা আল-আলায়হি ৪০ হাজার হাদীস থেকে তাঁর ‘কিতাবুল আসার’ নামক গ্রন্থে হাদীস নির্বাচন করেছেন।’

আল্লামা মুওয়াফফাক আল-মক্কী আল-আলায়হি-ই হাফিয আবু ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নীশাপুরী আল-আলায়হি-এর মানাকিবে আবী হানিফা গ্রন্থের বরাতে তাঁর নিজস্ব সনদে ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজিব আল-আলায়হি থেকে উদ্ধৃত করেন, আমি আবু হানিফা আল-আলায়হি-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার কাছে হাদীসের কতগুলো সিদ্ধুক রয়েছে, সেগুলো থেকে মানুষ উপকৃত হওয়ার মতো সামান্য কিছুই বের করেছি মাত্র।<sup>২</sup>

তাছাড়া আল্লামা মরতুযা আয-যাবীদী আল-আলায়হি عُوْدُالْجَوَاهِرِ الْمُتَمَيَّنَّةِ فِي أَدْلَةِ

গ্রন্থে ইমাম হাফিয আবু নুআইম আল-আসবাহানী আল-আলায়হি-এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনে নসর আল-আলায়হি-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, ‘আমি একবার ইমাম আবু হানিফা আল-আলায়হি-এর কাছে গেলাম। তখন দেখলাম, তাঁর কক্ষটি বই-পুস্তকে ভরে আছে। সেগুলো কিতাব তাঁর সময়কালে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর

<sup>১</sup> (ক) আবদুল কাদির আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানিফা, খ. ২, পৃ. ২১২, ক্র. ৬৬৬; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখে বগদাদ, খ. ১৫, পৃ. ৪৭৪; (গ) আল-মুওয়াফফাকুল মক্কী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খ. ১, পৃ. ১৯৫

<sup>২</sup> (ক) আবদুল কাদির আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানিফা, খ. ২, পৃ. ২১২, ক্র. ৬৬৬; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখে বগদাদ, খ. ১৫, পৃ. ৪৭৪; (গ) আল-মুওয়াফফাকুল মক্কী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খ. ১, পৃ. ১৯৫

মধ্যে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত সর্বপ্রথম কিতাব তাঁর সংকলিত কিতাবুল আসার।

যাঁরা নিজ শিষ্যদেরকে শুধু যে গ্রন্থখানি অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা নয়। বরং গুরুত্বারোপও করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘এ গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়া ফিকহশাস্ত্র অর্জন করা যাবে না।’ এ বাণীগুলো ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পরন্তু মুহাদ্দিসগণ কিতাবুল আসারের যে পরিচর্যা করেছেন তাতে অনুমিত হয়, এ গ্রন্থখানি তাঁদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। এ কারণেই এ গ্রন্থখানির অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর শিষ্য হাফিয যয়নুদ্দীন কাসিম ইবনে কুতলুবাগা রহমতুল্লাহু আলায়হ কিতাবুল আসারের ব্যাখ্যা এবং কিতাবুল আসারের সনদে আগত ব্যক্তিগণের ওপর একটি স্বতন্ত্র চরিতাভিধান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা ছাড়া ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও কিতাবুল আসারের বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণের ওপর একটি চরিতাভিধান লিখেছেন যার নাম الْأَيْنَةُ بِمَعْرِفَةِ رُؤَاةِ الْأَثَرِ। এ কিতাবখানির আলোচনা স্বয়ং হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হ تَعَجُّلُ الْمَنْفَعَةِ بِرُؤَاةِ رِجَالِ الْأَيْمَةِ কিতাবে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে কিতাবুল আসারের সকল বর্ণনাকারীর আলোচনাই উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা এ কিতাবখানি ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হ চার ইমাম: ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম শাফিযী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের আলোচনায় লিখেছেন।

অনুরূপভাবে হাফিয আবু বকর ইবনে হামযা আল-হুসাইনী রহমতুল্লাহু আলায়হ الذِّكْرُ নামক এক কিতাব লিখেছেন, যাতে বিশুদ্ধ ৬ হাদীস গ্রন্থ এবং ৪ ইমাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের আলোচনা করেছেন। এতে কিতাবুল আসারের সকল বর্ণনাকারী বিদ্যমান রয়েছেন।

এ ছাড়াও বড় বড় হাদীসশাস্ত্রবিদগণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলন করত মুসনদে আবু হানিফা নামে বিন্যস্ত করেছেন। এ সব মুসনদের সংখ্যা প্রায় ২০টি। মুসনদে ইমাম আবু হানিফা সংকলকগণের মধ্যে ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম হাফিয ইবনে আসাকির রহমতুল্লাহু আলায়হ, হাফিয আবুল আব্বাস আদ-দাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হ, হাফিয ইবনে মন্দাহ রহমতুল্লাহু আলায়হ, এমনকি হাফিয ইবনে আদী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তিনি প্রথম দিকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর চরম বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীতে যখন ইমাম তাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর সম্মান-মর্যাদা অনুমান করতে পারেন। তখন স্বীয় পূর্ববর্তী বদ্ধমূল ধারণাগুলোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি মুসনদে আবু হানিফা বিন্যস্ত করেন। এমনভাবে মুসনদে ইমাম আবু হানিফা নামে ১৭ অথবা ততোধিক পুস্তক সংকলিত হয়েছে। সেগুলো পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে খসর রহমতুল্লাহু আলায়হ জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আ'যম নামে একত্র করে দিয়েছেন।

বাস্তব কথা হলো, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর ওপরে যে অভিযোগ করা হয়, তাঁর হাদীসের ইলম খুবই কম, অথবা তিনি মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন বলে ইবনে খালদুন রহমতুল্লাহু আলায়হ কোন কোন লোকের সূত্রে যেমন উদ্ধৃত করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে একেবারে নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ। যা গোঁড়ামি অথবা অজ্ঞতা ছাড়া আর কোন নামে আখ্যায়িত করা যায় না। ইবনে খালদুন রহমতুল্লাহু আলায়হ কিসের ভিত্তিতে তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন তা তিনিই জানেন। মূলত ইবনে খালদুন রহমতুল্লাহু আলায়হ ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ থেকে এত দূরে ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে বাস্তব অবস্থায় জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে প্রকৃত কথা তাই যা আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী রহমতুল্লাহু আলায়হ গুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা লি-লহাযিমীর পার্শ্বটীকার ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর প্রচলিত হাদীসগুলো এরূপ ১৭টি ভলিউমে আছে, যেগুলোর সর্বাধিক ছোট ভলিমউমটিও সুনানুশ শাফিয়ী বি-রিওয়ায়াতিত তাহাবী এবং মুসনদুশ শাফিয়ী বি-রিওয়ায়াতি আবিল আব্বাস আল-আসাম্মের চেয়ে বড়। অথচ ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর হাদীসের ভিত্তিই হচ্ছে এ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ। জনৈক শিষ্যের উক্তি হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর রচনাবলিতে ৭০ হাজার হাদীস পাওয়া যায়। কেউ কেউ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এটা অতিরঞ্জিন বলে মনে করেন। কেননা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর রচনাবলিতে এত হাদীস বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু পূর্ববর্তীদের কর্মপন্থা স্মৃতিতে থাকলে উল্লিখিত উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট হাদীস বর্ণনা করার পন্থা ছিল দু'টি। যথা-

১. কখনো তাঁরা হাদীস সরাসরি নবী আকরম সালতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেন।
২. কখনো সতর্কতার লক্ষ্যে নবী করীম সালতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করার পরিবর্তে স্বয়ং নিজস্ব উক্তিরাপে ফিকহশাস্ত্রের মাসআলার আকারে বর্ণনা করে দিতেন।

এটা ছিল তাঁদের চূড়ান্ত সতর্কতা। যাতে তাঁদের উদ্ধৃতিতে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় সেটা যেন নবী করীম সালতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত না হয়। সাহাবা ও তাবেরীনের মধ্যকার যেসব মনীষী হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁরা সাধারণত দ্বিতীয় পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন যেমন- হযরত ওমর রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে যেসব মারফু হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক কিন্তু এক

সহস্রের কম। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা অনুযায়ী তাঁকে মধ্যস্তরের বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সুতরাং মুহাদ্দিসগণ তাঁকে মধ্যবর্তী স্তরে গণ্য করেছেন, কিন্তু হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহমতুল্লাহু আলায়হি ইয়ালাতুল খফা আন খিলাফাতিল খালাফা গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা উচিত। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মুকাসসিরীন সেসব হাদীস বর্ণনাকারীকে বলা হয়, যাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা এক সহস্রাধিক হবে। শাহ সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি হযরত ওমর রাযি-কে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো নিজস্ব উক্তি আকারে বর্ণিত রয়েছে। অনুরূপ কোন কোন তাবেরীর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো,

لَا نَنْقُولُ: قَالَ عَلَقَةَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

‘রাসূলুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলায়হি বলেছেন একথা বলার চেয়ে আলকামা বলেছেন অথবা আবদুল্লাহ বলেছেন, এরূপ বলা আমাদের কাছে অধিকতর পছন্দনীয়।’

এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পূর্ববর্তী মনীষীগণ অনেক মারফু হাদীস স্বয়ং নিজস্ব উক্তিরূপে ফিকহার মাসআলার আকারে উল্লেখ করে দিতেন। যদি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, তা হলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর বর্ণিত হাদীস ৭০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি এ পদ্ধতিটাই অবলম্বন করেছিলেন। এ বাস্তবতা সামনে রেখে ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহু আলায়হি প্রমুখ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে যে সব মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন, যদি সেসব অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে সেসবের মধ্যে এরূপ অসংখ্য মাসআলা পরিলক্ষিত হবে, যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত। এমতাবস্থায় ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা সম্ভব হাজারের অধিক হওয়াও অসম্ভবের কিছু নয়। তা ছাড়া প্রকৃত প্রশ্ন এ নয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি কতটি বর্ণনা অন্যদের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন? বরং প্রশ্ন হলো, কতটি বর্ণনা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছেছে? বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, যেহেতু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর হাদীস বর্ণনাকে নিজের আসল কর্মব্যস্ততায় পরিণত করার পরিবর্তে বিধি-বিধান উদ্ভাবনকে নিজের অভীষ্টরূপে বেছে নিয়েছেন, সেহেতু তাঁর অনেক বর্ণনা হাদীস আকারে আর অবশিষ্ট থাকেনি। বরং সেগুলো ফিকহশাস্ত্রের মাসায়েল আকারে অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি এমন একজন হাদীস ও ফিকহের ইমাম, যার কাছে وحديثات / أحاديث একজন সাহাবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস সংখ্যা ১৬টি যা অন্য কোনো ইমামের কাছে নেই। ثلاثیات অর্থাৎ দুই মাধ্যমের

প্রাপ্ত হাদীস ২৫৪টি। ২১৯টি মাদীস মারফ' হাদীস। আর ইমাম বুখারীর কাছে ২২টি হাদীস ثلاثيات রয়েছে, وحداثيات বা ثنائيات কোন হাদীস নেই।

### ইমাম আবু হানিফা رحمته الله -এর ওপর আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা

এক. সর্বপ্রথম আপত্তি, ইমাম নাসায়ী رحمته الله স্বীয় কিতাব আয-যু'আফায় ইমাম আবু হানিফা رحمته الله -এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

نُعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

‘সাবিত পুত্র নুমান ওরফে আবু হানিফা হাদীসশাস্ত্রে শক্তিশালী নন।’

এর উত্তর হচ্ছে, جرح وتعديل (জারাহ ওয়া তা'দীল)-এর ইমামগণ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাদীসের কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জারাহ ওয়া তা'দীলের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হলে এসব নীতিমালা দৃষ্টির সম্মুখে রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রকৃত কথা হলো, জারাহ ওয়া তা'দীলের ইমামগণ কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মর্যাদা ও বিশ্বস্ততায় মুতাওয়াতি'র পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তাঁর ব্যাপারে দু'এক জনের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা رحمته الله -এর ন্যায়পরায়ণতা ও ইমাম হওয়া মুতাওয়াতি'র পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে আছে। হাদীসের বড় বড় ইমাম তাঁর ইলম ও তাকওয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সুতরাং ইমাম সাহেব رحمته الله সম্পর্কে কোন ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ উত্তরের প্রতিউত্তরে আমাদের কালের কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এ আপত্তি করে বসেন যে, মুহাদ্দিসগণের প্রসিদ্ধ নীতি হচ্ছে, প্রত্যয়নের ওপর সমালোচনা অগ্রগণ্য। সুতরাং ইমাম সাহেব رحمته الله -এর ব্যাপারে যখন সমালোচনা ও প্রত্যয়ন উভয়ই রয়েছে। সুতরাং সমালোচনার দিকটি প্রাধান্য পাবে। এ আপত্তিটা মূলত জারাহ ও তা'দীলের মূলনীতি সম্বন্ধে অসচেতনতার ওপর ভিত্তিশীল। কেননা হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তা'দীলের ওপর জারাহ অগ্রগণ্য হয় এ নিয়ম নিঃশর্ত নয়। বরং এটি কতিপয় শর্তযুক্ত।

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কিত মন্তব্যগুলো পরস্পর দ্বন্দ্বমুখর হয়, সেগুলো প্রাধান্য দেয়ার জন্যে আলেমগণ প্রথমত দুটি পন্থা অবলম্বন করেছেন।

এক. প্রথম পন্থা যা জারাহ ও তা'দীলের দ্বিতীয় মূলনীতির মর্যাদা রাখে, তা খতীব বাগদাদী رحمته الله الْكَفَايَةُ فِي مَعْرِفَةِ أَصُولِ عِلْمِ الرَّوَايَةِ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

<sup>১</sup> আন-নাসায়ী, আয-যু'আফা ওয়াল মতরুকুন, পৃ. ১০০, ক্র. ৫৮৬



এরূপ জায়গায় দেখতে হবে, সমালোচকদের সংখ্যা অধিক নাকি প্রত্যয়নকারীদের সংখ্যা অধিক। যদিকে সংখ্যাধিক্য হবে, সেদিকটাই অবলম্বন করতে হবে।

শাফিয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্য থেকে আল্লামা তাজুদ্দীন আস-সুবকী রাহমতুল্লাহি ও বর্ণিত অভিমতই পোষণ করেন। যদি এ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। কেননা ইমাম সাহেব, রাহমতুল্লাহি-এর সমালোচনাকারীদের সংখ্যা হাতেগোনা অল্প কয়েক ব্যক্তি। অর্থাৎ ইমাম নাসায়ী রাহমতুল্লাহি, ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি, ইমাম দারাকুতনী রাহমতুল্লাহি ও হাফিয় ইবনে আদী রাহমতুল্লাহি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইমাম আবু জা'ফর আত-তাহাবী রাহমতুল্লাহি-এর ছাত্রত্ব বরণের পর ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। অপর দিকে ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক, যা গণনা করাও সম্ভব নয়। নমুনা স্বরূপ আমরা কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করছি।

১. জারাহ ওয়া তা'দীল শাস্ত্রের সর্বপ্রথম আলেম, যিনি হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক কথা বলেছেন, তিনি ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রাহমতুল্লাহি। যিনি আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস (হাদীসশাস্ত্রে বিশ্বাসী সমাজের নেতা) উপাধিতে খ্যাত, সেই মনীষী ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি (ইমাম আবু হানিফা) ছিলেন বিশ্বস্ত।
২. জারাহ ও তা'দীলের দ্বিতীয় ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর ছাত্র। ইমাম হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহমতুল্লাহি *তায়কিরাতুল হুফফায়* গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনু আবদিল বার রাহমতুল্লাহি *আল-ইনতিকা* গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি-এর সংসর্গে অবলম্বন করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করেছি। আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম, তখনই তাঁর চেহারা দেখতে পেতাম, তিনি প্রতাপশালী মহাসম্মানিত আল্লাহকে ভয় করতেন।
৩. জারাহ ও তা'দীলের তৃতীয় বড় ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রাহমতুল্লাহি-এর ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে মাজিন রাহমতুল্লাহি। তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি সম্পর্কে বলেন, তিনি হচ্ছে বিশ্বস্ত হাদীস সংরক্ষণকারী, নিজের সংরক্ষিত হাদীস থেকেই তিনি বর্ণনা করতেন। কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন বলে আমি শুনিনি।

৪. আরেক জায়গায় তাঁর কাছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি কি বিশ্বস্ত? তখন তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ, তিনি বিশ্বস্ত। মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেয়ে অনেক উর্ধ্বের পরহেযগার মানুষ। তিনি এর চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী। আল্লামা কুরদরী প্রণীত মানাবিকুল ইমামমিল আ'যম গ্রন্থে এরূপই লিখিত রয়েছে।
৫. জারাহ ওয়া তা'দীলের চতুর্থ বড় ইমাম হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহমতুল্লাহু আলায়হ। তিনি ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর ওস্তাদ এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই-বাছাই ও সমালোচনায় অতীব চরমপন্থী। ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হ ফাতহুল বারীর ভূমিকায় এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ হচ্ছেন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম হিশাম রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম ওকী রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম জা'ফর ইবনে আউন রহমতুল্লাহু আলায়হ প্রমুখ। তিনি বিশ্বস্ত, তাঁর মধ্যে দোষের কিছু নেই।
৬. তদ্রূপ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, ‘যদি আল্লাহ আমাকে আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ ও সুফিয়ান রহমতুল্লাহু আলায়হ দ্বারা সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে থাকতাম।’ এমনভাবে ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর বাণী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ ছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে বড় আলেম।’
৭. জারাহ ও তা'দীলের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনের দ্বিতীয় পদ্ধতি যা এ শাস্ত্রের তৃতীয় মূলনীতির মর্যাদা রাখে, সেটা ইমাম হাফিয ইবনে সালাহ রহমতুল্লাহু আলায়হ তাঁর মুকাদ্দামায় বর্ণনা পূর্বক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের নীতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। তা হচ্ছে, সমালোচনা যদি সুস্পষ্ট কারণ ভিত্তিক না হয়, তা হলে সর্বদা এ সমালোচনার ওপর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার অভিমত প্রাধান্য পাবে। বিশ্বস্ততার অভিমত সুস্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট যাই হোক। এ মূলনীতির ভিত্তিতে যদি দেখা হয়, তা হলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর বিরুদ্ধে যতগুলো সমালোচনা রয়েছে, তার সবগুলোই অস্পষ্ট, একটিও সুস্পষ্ট নয়। সুতরাং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বস্ততার অভিমতের সবগুলোই সুস্পষ্ট। কেননা তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত অভিমতগুলোতে তাঁর তাকওয়া, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি বিষয়ের সবই প্রমাণ করা হয়েছে।

মোটকথা তা'দীলের ওপর জারাহ অগ্রগণ্য হবে এ মূলনীতি তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন জারাহ সুস্পষ্ট হবে। আর সেই সমালোচনার কারণও যুক্তিসম্মত হবে। কোন কোন আলেমের নিকট এটাও একটি শর্ত যে, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রতিপন্নকারীদের সংখ্যা সমালোচনাকারীদের চেয়ে অধিক হবে না।

দুই. ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর ওপর দ্বিতীয় আপত্তি এই করা হয় যে, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله মীযানুল ই'তিদাল ফী আসমায়ির রিজাল গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

إِمَامٌ أَهْلُ الرَّأْيِ؛ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَآخِرُونَ.

‘কূফার অধিবাসী সাবিত পুত্র নু'মান হলেন যুক্তিবাদীদের নেতা। তাকে নাসায়ী, ইবনে আদী, দারাকুতনী ও অন্যান্য দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।’<sup>১</sup>

এর উত্তর হলো, মীযানূর ই'তিদাল গ্রন্থে এ বাক্য নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। এটা গ্রন্থকারের কথা নয়। বরং অন্য কোন ব্যক্তি এটা পাদটীকায় লিখে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তা মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অথবা কোন লিপিকারের অসতর্কতায় অথবা কেউ জেনে শুনে এটা মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। এর প্রমাণাদি নিম্নে পরিবেশিত হলো:

১. ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি এ গ্রন্থে সেসব বড় বড় ইমামের আলোচনা করব না, যাঁদের অত্যাচ সম্মান-সুখ্যাতি তাওয়াতুর (ধারাবাহিক) সীমায় পৌঁছে গেছে। তাদের ব্যাপারে কেউ কোন কথাবার্তা বললেও তাঁদের আলোচনা করা হবে না। অত্যন্ত সম্মান সুখ্যাতির কারণে যেসব ইমামের আলোচনা করা হবে না বলে বলেছেন, তাঁদের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর নামও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে এটা আবার কিভাবে সম্ভব যে, তিনি উক্ত কিতাবে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর সমালোচনা করেছেন।
২. আবার যেসব বড় বড় ইমামের আলোচনা ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله মীযানুল ই'তিদাল কিতাবে করেননি, তাঁদের আলোচনার জন্যে তিনি তায়কিরাতুল হুফফায় একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন এ কিতাবটিতে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর শুধু যে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে তা নয়। বরং তাঁর বিরাট প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمته الله স্বীয় কিতাব লিসানুর মীযান প্রণয়নে মীযানুল ই'তিদালের ওপরই নির্ভর করেছেন। অর্থাৎ যাঁদের আলোচনা মীযানুল ই'তিদালে নেই, শুধু কয়েকজন ছাড়া তাঁদের আলোচনা লিসানুল মীযান গ্রন্থেও নেই। লিসানুল মীযান কিতাবে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর আলোচনা ছিল না। এটি একথাই প্রমাণ করে যে, আলোচিত

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ৪, পৃ. ২৬৫, ক্র. ৯০৯২

একথাগুলো মূলত মীযানুল ই'তিদালেও ছিল না, যা পরবর্তীতে কেউ করেছেন।

৪. সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুন্দাহ আর-রফউ ওয়াত তাকমীল কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্যিকায় লিখেছেন, আমি সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের আল-মাকতাবাতুয যাহিরিয়ায় মীযানুল ই'তিদালের একটি পাণ্ডুলিপি দেখেছি (কোড # ৩৬৮), যা আগাগোড়া হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله-এর জনৈক ছাত্র শায়খ শারফুদ্দীন আল-ওয়ানী رحمته الله-এর কলমে লিখিত। তাতে এটা স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, আমি আমার এ কপিটি আমার শিক্ষাগুরু হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله-এর সম্মুখে ৩ বার পড়েছি এবং তাঁর পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেছি। সেই কপিতে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর কোনো আলোচনা নেই।

৫. আমি মরক্কোর রাজধানী রাবাতের বিখ্যাত গ্রন্থাগার আলখায়ানাতুল আমিরায় ১৩৯ ক্রমিকে মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থটির কলমে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি দেখেছি। যার ওপর হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله-এর অনেক শিষ্যের এ গ্রন্থ পড়ার তারিখগুলো লিখিত রয়েছে। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله-এর এক শিষ্য তাঁর সম্মুখে তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর পূর্বে এ গ্রন্থ পড়েছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপিতেও ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর সমালোচনা নেই। এটা একথার দালিলিক প্রমাণ যে, মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর সমালোচনামূলক বাক্যটি পারবর্তীতে কেউ বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা মূল কপিতে ছিল না।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-কে দুর্বল আখ্যায়িতকরণ ও তাঁর খুঁত বর্ণনার অভিযোগ থেকে ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله-এর আঁচল সম্পূর্ণ পবিত্র। তা ছাড়া ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী رحمته الله এ ধরনের কথা কিভাবেই বা লিখতে পারেন? যেখানে তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা رحمته الله-এর জীবনচরিত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই লিখেছেন।

তিন. তৃতীয় আপত্তি এই করা হয়ে থাকে যে, ইমাম দারাকুতনী رحمته الله স্বীয় সুনান গ্রন্থে লিখেছেন,

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ  
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

‘আবু হানিফা থেকে বর্ণিত, মুসা ইবনে আবু আয়িশা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ <sup>রাঃ</sup> থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল <sup>সঃ</sup> ইরশাদ করেন, ‘যার নামাযে ইমাম রয়েছেন, ইমাম সাহেবের কুরআন পাঠ তার কুরআন পাঠের জন্য যথেষ্ট।’ মুসা ইবনে আবী আয়িশা থেকে আবু হানিফা ও হুসাইন বিনে উমারা ছাড়া অপর কেউ এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করেননি। আর এ উভয় বর্ণনাকারী দুর্বল।’<sup>১</sup>

উল্লিখিত সমালোচনার উত্তর হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা <sup>রাঃ</sup> সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী <sup>রাঃ</sup>-এর সমালোচনা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। কিন্তু তার উত্তর সেটাই, যা ইমাম নাসায়ী <sup>রাঃ</sup>-এর সমালোচনার উত্তরে বলা হয়েছে। ভাবনার বিষয় হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা <sup>রাঃ</sup> সম্পর্কে ইমাম শু’বাহ <sup>রাঃ</sup>, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান <sup>রাঃ</sup>, ইয়াহইয়া ইবনে মাজিন <sup>রাঃ</sup>, আলী ইবনুল মাদীনী <sup>রাঃ</sup>, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক <sup>রাঃ</sup>, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী <sup>রাঃ</sup>, ওকী’ ইবনুল জাররাহ <sup>রাঃ</sup>, মক্কী ইবনে ইবরাহীম <sup>রাঃ</sup>, ইসরাঈল ইবনে ইউনুস <sup>রাঃ</sup> এবং ইয়াহইয়া ইবনে আদম <sup>রাঃ</sup>-এর মতো সমকালীন হাদীসের ইমামদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, নাকি তাঁদের নিকটবর্তী যুগের লোকদের অথবা ইমাম সাহেব <sup>রাঃ</sup>-এর দু’শ বছর পরে জন্মগ্রহণকারী ইমাম দারাকুতনী <sup>রাঃ</sup>-এর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে? বরং ইয়াহইয়া ইবনে মাজিন <sup>রাঃ</sup>-এর অভিমত থেকে তো জানা যায়, তাঁর সময়কাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইমাম সাহেব <sup>রাঃ</sup>-এর সমালোচনা করেননি। কেননা তিনি বলেন, ‘আমি কাউকে তাঁর সমালোচনা করতে শুনি নি।’

সায়মুরী <sup>রাঃ</sup> থেকে আল্লামা কারদারী <sup>রাঃ</sup> নিজ সনদে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক <sup>রাঃ</sup>-এর উক্তি মানাকিবুল ইমামিল আ’যমের প্রথম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ‘আমি সিরিয়ায় এসে ইমাম আওয়ায়ী <sup>রাঃ</sup>-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যখন গুনলেন, আমি কূফা থেকে এসেছি, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কূফায় আবির্ভূত এ বেদআতী কে যার ডাকনাম আবু হানিফা? ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক <sup>রাঃ</sup> বলেন, আমি সে সময় তাঁকে কোন বিস্তারিত উত্তর দেয়া সমীচীন মনে করিনি। আমি নিজ বাসস্থানে চলে এলাম। আমি পরে তিন দিনে আমার কাছে সংরক্ষিত ইমাম আবু হানিফা <sup>রাঃ</sup>-এর উদ্ভাবিত ফিকহী মাসআলাগুলোর এক সংকলন তৈরি করি। সেগুলোর শুরুতে ‘আবু হানিফা বলেছেন’-এর স্থলে নু’মান ইবনে সাবিত

<sup>১</sup> আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১০৭, হাদীস: ১২৩৩

বলেছেন' লিখে দিলাম। তৃতীয় দিনে তা ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তা নিরীক্ষণ করলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নুমান কে? আমি বললাম, এ সেই আবু হানিফা, আপনি যার সমালোচনা করেছেন। এরপর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়। যেসব মাস'আলা-মাসায়েল আমি লিখে ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে পেশ করেছিলাম, সেগুলো নিয়ে উভয়ের মাঝে কথাবার্তা চলছিল। ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আমার চেয়ে অধিক স্পষ্ট করে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর চলে যাওয়ার পর আমি ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তাঁকে কেমন দেখলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি লোকটির জ্ঞানের আধিক্য ও বুদ্ধির প্রখরতার কারণে তার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি তো তাঁকে অভিযুক্ত করে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছি। কেননা তাঁর সম্বন্ধে আমার কাছে যা কিছু পৌঁছেছে, তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোদ্দাকথা হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর স্থান অত্যন্ত উঁচু স্তরে। যে সব মহান ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁরা ভুল তথ্যাবলির ভিত্তিতেই এমন ছিলেন। এ কারণেই দেখা যাচ্ছে, যারা ইনসাফের সাথে ইমাম সাহের রাহিমাহুল্লাহ-এর অবস্থা নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বিশাল মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ওপর আরোপিত আপত্তিগুলো সঠিক নয়। তাই নবাব সিদ্দীক হাসান খান রাহিমাহুল্লাহ আত-তাজুল মুকাম্মাল গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ফিকহ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও দীনদারীর প্রশংসা করেছেন এবং পরিশেষে লিখেছেন,

وَلَمْ يَكُنْ يُعَابُ بِشَيْءٍ سِوَى فَلَّةِ الْعَرَبِيَّةِ.

‘আরবী ভাষার জ্ঞানের অভাব ছাড়া তাঁর প্রতি অন্য কোন দোষারোপ করা হয়নি।’<sup>১</sup>

এখানে নবাব সিদ্দীক হাসান খান রাহিমাহুল্লাহ হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ওপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। তবে আরবী ভাষা জ্ঞানের অভাব আছে বলে অভিযুক্ত করেছেন। আর এ অভিযোগও কোন প্রকারেই সঠিক নয়। মূলত নবাব সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এ বাক্যটি কাযী ইবনে খল্লিকান রাহিমাহুল্লাহ-এর

<sup>১</sup> সিদ্দীক হাসান খান, আত-তাজুল মুকাম্মাল মিন জাওয়াহির মাআসিরিত তারায়িল আখির ওয়াল আওয়াল, পৃ. ১২৬, ক্র. ১১৯

ওয়াফায়াতুল আ'য়ান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।<sup>১</sup> কিন্তু এর পরক্ষণেই কাযী ইবনে খল্লিকান রাহমাতুল্লাহু আলায়হি এ অভিযোগের যে প্রতিবাদ করেছেন, সেটা নবাব সাহেব উল্লেখ করেননি। কাযী ইবনে খল্লিকান রাহমাতুল্লাহু আলায়হি লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি-এর ওপর আরবী ভাষাজ্ঞানের অভাবের যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, তা একটি ঘটনার ওপর ভিত্তিশীল।

ঘটনা হচ্ছে এই, একদিন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি মসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক বিখ্যাত বৈয়াকরণিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দেয়, তা হলে তার ওপর কিসাস আসবে কি-না? ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি বললেন, আসবে না। এতে বৈয়াকরণিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যদিও তাকে পাথর নিক্ষেপ করল? উত্তরে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি বললেন, وَلَوْ قَتَلَهُ بِأَبَا فُبَيْسٍ (হ্যাঁ, যদিও তাকে আবু কুবাইস পর্বতে নিক্ষেপে হত্যা করে?) এতে উক্ত বৈয়াকরণিক প্রচার করে দিলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি-এর আরবী ভাষায় দক্ষতা নেই। কেননা তাঁর بِأَبِي فُبَيْسٍ বলা উচিত ছিল।

ইবনে খল্লিকান রাহমাতুল্লাহু আলায়হি লিখেন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি-এর ওপর আরবী ভাষা জ্ঞানে স্বল্পতার আপত্তি ঠিক নয়। কেননা আরবের কোন কোন গোত্রের ভাষায় যের ব্যবহারযোগ্য অবস্থায়ও আসমায়ে সেত্তা মোকাব্বারায় আলিফ ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- জনৈক কবির এক বিখ্যাত ছত্র হচ্ছে,

قَدْ بَلَّغْنَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا	*	إِنْ أَبَاهَا وَأَبَا وَأَبَاهَا
---	---	----------------------------------

‘তার পিতা ও পিতামহ নিশ্চয়ই সম্মান মর্যাদার শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছেন।’<sup>২</sup>

এখানে আরবী ব্যাকরণের বিধান অনুসারে أَبَا أَبَاهَا হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কবি যেরযোগ্য অবস্থায়ও কার চিহ্ন الف (আলিফ) ব্যবহার করেছেন। অতএব ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি-এর ওপরে উল্লিখিত আরবি উক্তি কোন কোন গোত্রের ভাষার ব্যবহারবিধি অনুযায়ী ছিল। তাই শুধু এ ঘটনাকে ভিত্তি করে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলায়হি-এর মতো ব্যক্তিত্বের ওপর আরবী ভাষাজ্ঞানে স্বল্পতার অভিযোগ অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

<sup>১</sup> ইবনে খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আখ্যাত আবনায়িয যামান, খ. ৫, পৃ. ৪১৩

<sup>২</sup> ইবনে খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আখ্যাত আবনায়িয যামান, খ. ৫, পৃ. ৪১৩

চার. ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمہ اللہ তাহযীবুত তাহযীব কিতাবে কতক হাদীস ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সে (নুআইম ইবনে হাম্মাদ رحمہ اللہ) আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর দোষ বর্ণনায় এমন সব কিছা-কাহিনী বলে বেড়াতে, যার সবগুলোই ছিল মিথ্যা।’

এরপর এসব গাল-গল্পের প্রতিউত্তরের আর প্রয়োজন থাকে না। তা ছাড়া ভাবনার বিষয় হচ্ছে, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ যখন স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর ছাত্র, সেখানে তিনি এমন কথা কি করে বলতে পারেন? ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ (যিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন) ফিকহশাফে প্রায় নব্বই শতাংশ মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمہ اللہ বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ যখন তার ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের জন্য আসেন তখন তিনি সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ-এর কাছে এলে তিনি নিজ পাঠদানের আসর থেকে ওঠে এসে ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-কে অভ্যর্থনা জানান। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কেউ এ সম্মান প্রদর্শনের ওপর প্রশ্ন তুললে ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ উত্তর দিলেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি দীনের ইলমে বিশেষ এক মর্যাদার সমাসীন। আমি যদি তাঁর জ্ঞানের সম্মানার্থে না দাঁড়াই তা হলে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে আমাকে দাঁড়াতে হবে। তাঁর বয়সের কারণে যদি না দাঁড়াই তা হলে তাঁর ফিকহশাফী জ্ঞানের জন্যে দাঁড়াতে হবে। আর যদি এ জন্যেও না দাঁড়াই তা হলে অন্তত তাঁর পরহেযগারির জন্যে আমাকে দাঁড়াতে হবে। সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-কে কতই না সম্মান করতেন এ ঘটনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শায়খ আবদুল ওয়াহাব শা’রানী رحمہ اللہ আল-মীযানুল কুবরা গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের ওপর কিয়াসকে অগ্রবর্তী মনে করেন। প্রথম প্রথম সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ ও কোন কোন লোকের এ মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সুফিয়ান আস-সাওরী رحمہ اللہ, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান رحمہ اللہ, হাম্মাদ ইবনে সালামা رحمہ اللہ এবং জা’ফর সাদিক رحمہ اللہ ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর নিকট গমন করেন। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা চলছিল। এতে ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ নিজ মায়হাবের পক্ষে অনেকগুলো দলীল-প্রমাণ পেশ করেন। পরিশেষে সকল মনীষী ইমাম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর হস্ত চুম্বন করেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি আলেম সমাজের শিরোমণি। সুতরাং আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যাপারে



অজানাবশত আমাদের পক্ষ থেকে অতীতে যা ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে, সে জন্যে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

পাঁচ. একটি আপত্তি এও করা হয়ে থাকে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনাগুলো ৬টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে অনুপস্থিত। এতে বোঝা যায়, ৬ জন ইমামের কারো কাছেই তিনি প্রামাণ্য ব্যক্তি ছিলেন না।

এর জবাব হলো, এটা অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধিপ্রসূত এবং অজ্ঞতামূলক আপত্তি। ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলক ইমামদের নিজ নিজ গ্রন্থে কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমামের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত না করা সংশ্লিষ্ট ইমামের দুর্বল হওয়া অবশ্যম্ভাবী করে দেয় না। এটা সুস্পষ্ট কথা, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর কোন বর্ণনাও নিজ গ্রন্থে নেননি। এমনকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ, যিনি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর ওস্তাদ এবং তিনি দীর্ঘকাল যাঁর সঙ্গ লাভ করেছিলেন, সেই ইমাম সাহেবের বর্ণনাও সমগ্র বুখারী শরীফে মাত্র দু'টি। একটি হাদীসে মু'আল্লাকরূপে বর্ণিত। অপরটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ কোন এক মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে কোন বর্ণনা উদ্ধৃত করেননি। অথচ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ-এর ওস্তাদ। তদ্রূপ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুসনদ গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর কেবল ৩টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর সনদকে বিশুদ্ধতর সনদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায় যে, ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ৩ জনই দুর্বল? এ বিষয়ে প্রকৃত কথা সেটাই যা আল্লামা যাহিদ আল-কাওসরী রাহিমাহুল্লাহ গুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা লিল-হাযিমী গ্রন্থের পার্শ্ব টীকায় লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, প্রকৃতপক্ষে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের সংরক্ষণ করা অধিকতর লক্ষ্য ছিল সে হাদীসগুলোর যেগুলোর বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুরূপ মহান ব্যক্তিবর্গের শিষ্য ও অনুসারীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাঁদের বর্ণনাগুলো বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। সে জন্যে তাঁরা সেগুলোর সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণের তেমন প্রয়োজন মনে করেননি।

ছয়. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ওপরে সবচেয়ে বড় আপত্তি করা হয়, তিনি কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার ওপর কiyাসকে প্রাধান্য দিতেন।

এর উত্তর হলো, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা, বরং এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তো কখনো কখনো বিতর্কিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতেও কiyাস

পরিত্যাগ করেছেন। যেমন- অটুহাসিতে অযু ভঙ্গের মাসআলায় তিনি কিয়াস পরিহার করেছেন। অথচ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলো বিতর্কিত এবং অপর ইমামগণ সেগুলো পরিহার করে কিয়াসের ওপর আমল করেছেন। এ মাসআলায় স্বয়ং শাফি'রী মতাবলম্বী শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী রাহতুল্লাহ আল-মীযানুল কুবরা গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন। যার শিরোনাম: ‘এ পরিচ্ছেদ ইমাম আবু হানিফা রাহতুল্লাহ কিয়াসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, একথা যিনি তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করেন তার দুর্বলতা প্রসঙ্গে।’

উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি লিখেন, ‘জেনে রাখুন, একথা যার মুখ থেকে বের হয়েছে, সে ইমাম আবু হানিফা রাহতুল্লাহ এর প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। সে দীনি বিষয়ে হঠকারী, কথাবার্তায় অসাবধান এবং আল্লাহ তা'আলা বাণী:

إِنَّ السَّخِرَ وَالْبَصَرَ أَفْقَادُ كُلِّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ ۝

‘নিঃসন্দেহে শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তকরণ এসবের প্রতিটি সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞেস করা হবে।’

ইমাম আবু জাফর আশ-শীযামারী রাহতুল্লাহ (শীযামার বলখের জনপদসমূহের একটি) ইমাম আবু হানিফা রাহতুল্লাহ থেকে নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি আমাদের সম্পর্কে বলে, আমরা কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দেই, সে মিথ্যা বলে এবং আমাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। নস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিয়াসের কোন প্রয়োজন পড়ে কি? ইমাম আবু হানিফা রাহতুল্লাহ প্রায়শ বলতেন, আমরা একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কিয়াসের আশ্রয় নেই না। আর তা এ জন্যে যে, আমরা প্রথম এ মাসআলা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি দেই। কোন প্রমাণ না পেলে শুধু তখনই আমরা কিয়াসের আশ্রয় নেই। অন্যথায় নয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাদের নিকট যা বর্ণিত হয়েছে তা নতশিরে মান্য, তাতে মতবিরোধ করার কোন অবকাশ নেই। আর তাঁর সাহাবীদের মতামত আমরা বাছাই করে গ্রহণ করব। তাঁ ছাড়া অন্যদের যে অভিমত আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো তাঁরাও আমাদের মত মানুষ।

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী রাহতুল্লাহ আরও বলেন, হে ভ্রাতা! জেনে রাখ, ইমাম আবু হানিফা রাহতুল্লাহ এর প্রতি সুধারণা ও আন্তরিকতাবশত আমি তার পক্ষে সাফাই বর্ণনা করিনি, যেমন কিছু লোক করে থাকে। বরং আমি

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা ১৭:৩৬

কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত দলীলাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণার পরেই তাঁর পক্ষে সাফাই বর্ণনা করছি। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর মাযহাবই সর্বপ্রথম মাযহাব এবং তাই সর্বশেষ মাযহাব, যেমন কিছু দিব্যদৃষ্টির অধিকারী বলেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর সকল দলীল খুব ভালোভাবে পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইমাম সাহেবের দলীলসমূহের উৎস হচ্ছে কুরআনুল করীম, সহীহ হাদীস, হাসান হাদীস ও এমন দুর্বল হাদীস যা অন্যভাবে কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে হাসান হাদীসে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি কোন দুর্বল হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেননি।

এ ছাড়াও পূর্ববর্ণিত হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের বিধানসমূহ স্মরণ রাখলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফী মাযহাব সম্পর্কে উত্থাপিত সর্বঅভিযোগের উত্তর সহজেই জানা যাবে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি সম্পর্কে উল্লিখিত কথাগুলোই একজন ন্যায় বিচারকের জন্য যথেষ্ট।

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ সহায়ক হবে:

১. إِنْجَاء الْوَطَنِ عَنِ الْإِزْدِرَاءِ بِإِمَامِ الرَّمَنِ, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহু আলায়হি
২. الَرْعُ وَالْكَمِيلُ فِي الْ-جَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ, মাওলানা আবদুল হাই লখনৌবী রহমতুল্লাহু আলায়হি, টীকা: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালাবী রহমতুল্লাহু আলায়হি
৩. التَّعْلِيلُ الْ-مُجَدُّ عَلَى مَوْطَأِ مُحَمَّدٍ, ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহু আলায়হি, পুনঃবিন্যাস: মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী রহমতুল্লাহু আলায়হি
৪. الْإِنْفَاطُ فِي فَصَائِلِ الصَّلَاةِ لِلْأَيْمَةِ الْفُقَهَاءِ, হাফিয ইবনে আবদুল বার আল-উন্দুলুসী রহমতুল্লাহু আলায়হি
৫. تَبْيُضُ الصَّحِيفَةِ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ, ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রহমতুল্লাহু আলায়হি।

## ইমামদের তাকলীদ বা অনুসরণ প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। বরং রাসূলের আনুগত্য এ জন্য করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ ব্যতীত আনুগত্যের উপযুক্ত অন্য কোন সত্তা নেই। একথা সুস্পষ্ট, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, আর এটাও সম্ভব নয় যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো শিখবে।

কুরআন ও সুন্নাহর কোন কোন বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিতও বটে, তাতে না আছে কোন অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা, আর না পারস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব। যেমন ব্যভিচার হারাম হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রমযানের রোযা, হজ্জ ফরয হওয়ার এবং মাহরামদের সাথে বিয়ে অবৈধ হওয়া ইত্যাদি। কুরআন-সুন্নাহ থেকে এ ধরনের বিধান সহজেই বুঝে নিতে পারবে। এ ধরনের বিধান বুঝে নেয়ার জন্য না এ ইজতিহাদের প্রয়োজন আছে, না তাকলীদের। তবে কুরআন-সুন্নাহ যে সব বিধান সুস্পষ্ট নয় এবং তাতে দালীলিক বিরোধও দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ প্রয়োজন হয়।

তাকলীদ আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা। আর যে বস্তুকে গলায় পেঁচানো হয় তাকে ‘কিলাদা’ বলে।

### তাকলীদের সংজ্ঞা

তাকলীদের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একই সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে একটা সংজ্ঞার সাথে অন্য সংজ্ঞার কিছু তারতম্য রয়েছে। এখানে আমরা তাকলীদের তিনটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করবো।

তাকলীদের প্রথম সংজ্ঞা: আল্লামা আবুল হাসান আল-আমাদী আল্লামা তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

التَّقْلِيدُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ.

‘আবশ্যক কোনো দলীল ব্যতীত অন্যের কথার ওপর আমল করা।’<sup>১</sup>

এখানে ‘আল-আমালু বি কওলিল গায়র’ (অন্যের কথা অনুযায়ী আমল)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ‘কওল’ (কথা) দ্বারা অন্যের কথা ও কাজ দুটিই অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লামা তাফতযানী আল্লামা-এর অভিमत। এখানে ‘হজ্জত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন দলীল যা গ্রহণ ও যার ওপর আমল করা আবশ্যিক। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা। অতএব এ শর্তের দ্বারা যেসব ক্ষেত্রে হজ্জত পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে তার অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন-

১. আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করা। কেননা এখানে আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করার হজ্জত হচ্ছে সেসব দলীল যা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলবর্গের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং সরাসরি আল্লাহর কোনো নির্দেশের ওপর আমল করা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

<sup>১</sup> আবুল হাসান আল-আমাদী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, খ. ৪, পৃ. ২২১

২. হযরত রাসূল ﷺ-এর কথা অনুযায়ী আমল করা। এও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এখানে হুজ্জত হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের কথা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।
৩. ‘মুসলিম উম্মাহর ইজমার ওপর আমল করা।’ এটিও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁদের ঐক্যমতের ওপর আমলের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে।
৪. কাযীর জন্য সাক্ষীর কথা অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। এটি তাকলীদ নয়। কেননা সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সাক্ষীর কথা গ্রহণের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে এবং এর ওপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৫. মুফতীর ফতওয়ার ওপর ‘সাধারণ মানুষের আমল’। এটিও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ বিষয়ে শরীয়তের হুজ্জত আছে। আর তা হচ্ছে এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ প্রয়োজন হলে মাসআলার জন্য ফতওয়া প্রদানকারীর শরণাপন্ন হবে এবং মুফতীর ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা তার ওপর আবশ্য হবে। এখানে হুজ্জত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ইজমা। এ ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহেও এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে।
৬. হাদীস বর্ণনাকারী (রাবী)-এর নিকট ‘আমলযোগ্য’ কোনো হাদীস গ্রহণ করে তার ওপর আমল করলে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এখানে হুজ্জত হলো, আল্লাহর রাসূল আদেশ করেছেন, ‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও এবং উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দাও।’
৭. কোনো সাহাবীর এমন বক্তব্য যার সাথে অন্য সাহাবীগণ বিরোধিতা করেননি, তার ওপর আমল করাও তাকলীদ নয়। কেননা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত রয়েছে।

একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনে আবদুশ শাকুর رحمته الله তাঁর মুসাল্লামুস সুবূত কিতাবে। আল্লামা ইযযুদ্দীন رحمته اللهও শরহে মুখতাসারে ইবনে হাজিবে এ ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

১. আল্লামা ইবনে হাজিব رحمته الله তাকলীদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যে,

الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ.

‘আবশ্যক দলীলবিহীন অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা।’

২. ইমাম গাযালী رحمته الله তাঁর আল-মুস্তাফা কিতাবে লিখেছেন,

<sup>১</sup> আবদুল হাই লাখনবী, ফাওয়াতিহুর রাহামূত ফী শরহি মুসাল্লামুস সুবূত, খ. ৪, পৃ. ২২১

التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ.

‘আবশ্যক দলীলবিহীন অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা।’<sup>১</sup>

৩. ইমাম ইবনে কুদামা আলায়াহি লিখেছেন,

قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ.

‘হুজ্জত ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করাই হচ্ছে তাকলীদ।’<sup>২</sup>

মৌলিক দিক থেকে এ সংজ্ঞাগুলো এবং পূর্বোক্ত আল্লামা সাইফুদ্দীন আল-আমাদী আলায়াহি-এর সংজ্ঞার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এসব সংজ্ঞা থেকে তাকলীদ সম্পর্কে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে,

১. শরীয়তের বিষয়ে ‘আম লোক (যে মুজতাহিদ নয়)’ তারই সমশ্রেণীর আরেকজন আম লোকের কথা অনুযায়ী আমল করা।
২. একজন মুজতাহিদ আলেম আরেকজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা, আমলকারী মুজতাহিদ এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করুক বা না করুক।
৩. মুজতাহিদ নয় এমন কোনো ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোনো মুজতাহিদ আমল করা।

তাকলীদের দ্বিতীয় সংজ্ঞা: আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকী আলায়াহি তাঁর *জামউল জাওয়ামি* গ্রন্থে তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে,

التَّقْلِيدُ: أَخَذُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ دَلِيلِهِ.

‘আবশ্যক কোনো দলীল ব্যতীত অন্যের কথার ওপর আমল করা।’<sup>৩</sup>

এখানে ‘অন্যের কথা গ্রহণ’ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্যের কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তার ওপর আমল করা। ‘দলীল সম্পর্কে অবগত না হয়ে’ কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে ইমাম জালাল উদ্দীন আল-মহল্লী আলায়াহি *জামউল জাওয়ামি*’র ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, ‘দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কিভাবে দলীল থেকে মাসআলা বেরা করা হয় সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। এটি মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রথমত দলীলটি দলীল হওয়ার জন্য তার প্রতিবন্ধক (عارض) বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি। আর দলীলের সব ধরনের ত্রুটি ও প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আনুষঙ্গিক সকল দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে সম্পর্কে গবেষণার ওপর

<sup>১</sup> আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, পৃ. ৩৭০

<sup>২</sup> ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী, *রওয়াতুন নাযির ওয়া জাম্নাতুল মানাযির*, খ. ২, পৃ. ৩৮১

<sup>৩</sup> তাজউদ্দীন আস-সুবকী, *জামউল জাওয়ামি*, খ. ২, পৃ. ৪৩২

নির্ভর করে। আর এ ধরনের গবেষণা করা মুজতাহিদের কাজ। কেননা শরীয়তের বিষয়ে ‘আম লোক’ সে স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।’

১. আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকী رحمۃ اللہ علیہ -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাধারণ লোক কোনো মুজতাহিদ আলেমের কথা গ্রহণ করে তবে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আল্লামা আবুল হাসান আল-আমাদী رحمۃ اللہ علیہ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সে অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণের বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো মুজতাহিদ পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছতে না পারে, তখন সে মাসআলার ক্ষেত্রে মুফতীর কাছ থেকে ফতওয়া নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত আছে। সুতরাং আল্লামা আবুল হাসান আল-আমাদী رحمۃ اللہ علیہ -এর নিকট এটি তাকলীদ নয়। পক্ষান্তরে আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকী رحمۃ اللہ علیہ -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাধারণ মানুষ দলীল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে অক্ষম। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া رحمۃ اللہ علیہ উসূলের ওপর তাঁর বিখ্যাত *আল-মুসাওয়াদায়* লিখেছেন,

التَّقْلِيدُ: قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

‘দলীল ছাড়া কেনো কথা গ্রহণ করা।’

২. শায়খ যাকারিয়া আল-আনসারী رحمۃ اللہ علیہ তাঁর *গায়াতুল উসূল* গ্রন্থে লিখেছেন,

أَخَذَ قَوْلَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ دَلِيلِهِ.

‘আবশ্যক কোনো দলীল ব্যতীত অন্যের কথার ওপর আমল করা।’

৩. আবু বকর আশ-শাশী رحمۃ اللہ علیہ লিখেছেন,

التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَنْ أَقَالَ.

‘তাকলীদ হচ্ছে অন্যের কথা গ্রহণ করা, অথচ সে কোথা থেকে বলছে তা তুমি জান না।’

এসব সংজ্ঞার মধ্যে আক্ষরিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এসবের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এসব সংজ্ঞা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন—

১. শরীয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় (আম লোক) এমন ব্যক্তির কথা আরেকজন আম লোক গ্রহণ করা।

<sup>১</sup> ইবনে তায়মিয়া, *আল-মুসাওয়াদা ফী উসূলিল ফিকহ*, পৃ. ৪৬২

<sup>২</sup> কায়ী যাকারিয়া, *গায়াতুল উসূল ফী শরহি লুন্বিলা উসূল*, পৃ. ১৫৮

২. কোনো মুজতাহিদ সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ না করে অন্য একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদের ওপর আমল করা।
৩. মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি (আম লোক) কোনো মুজতাহিদ আলিমের তাকলীদ করা।
৪. কোনো মুজতাহিদ কোনো আমীর কথার ওপর আমল করা।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো মুজতাহিদ যদি অন্য মুজতাহিদের মতের সাথে তার দলীল সম্পর্কে অবগত তার কথা অনুসরণ করে তবে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আমরা তাকলীদের দ্বিতীয় যে সংজ্ঞা দিয়েছি এ সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে, কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার কোনো বিষয় গ্রহণ করা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত কিনা? প্রথম সংজ্ঞায় এ বিষয়গুলো এবং আরও কিছু বিষয়ের অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমরা তাকলীদের তৃতীয় আরেকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করবো, যেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

**তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞা:** তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনে হুমাম رحمتهما তাঁর আত-তাহরীর গ্রন্থে, তিনি লিখেছেন,

الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى السُّبُحِجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا.

‘তাকলীদ হচ্ছে দলীলবিহীন এমন ব্যক্তির কথার ওপর আমল করা যার কথা শরীয়ত স্বীকৃত কোনো দলীলের অন্তর্ভুক্ত নয়।’<sup>১</sup>

এখানে ‘শরীয়ত স্বীকৃত হুজ্জত’ বা ‘দলীলের অন্তর্ভুক্ত নয়’ এমন কথার দ্বারা কুরআন, রাসুলের সুন্নত ও ইজমার ওপর আমল করার বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসবের পর আমলের ব্যাপারে শরীয়ত স্বীকৃত নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কাযী যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন। এ ক্ষেত্রে সাক্ষীর কথা অনুযায়ী কাযীর ফায়সালা দেওয়াটা তাকলীদ নয়। কেননা তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর নিকট থেকে ‘আমলযোগ্য’ হাদীস গ্রহণ করলে তার ওপর আমল করাও তাকলীদ নয়। তেমনিভাবে কোনো সাহাবীর মতামতের সাথে যদি অন্য সাহাবীরা একমত হন এবং কেউ তার বিরোধিতা না করেন তবে তার কথা অনুসরণ করাও তাকলীদ নয়। কেননা এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে।

কোনো সাধারণ মানুষের জন্য মুফতীর ফতওয়ার ওপর আমল করা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? কিছু কিছু আলেম মনে করেন, সাধারণ মানুষের

<sup>১</sup> ইবনে আমীর হাজ, আত-তাহরীর ওয়াত তাহরীর, খ. ১, পৃ. ৪৩



জন্য মুফতীকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত রয়েছে। সুতরাং এটি তাকলীদ নয়। তবে ব্যাপকভাবে ওলামায়ে কেরাম একে তাকলীদে অস্তিত্ব মনে করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মুফতীর ফতওয়ার ওপর নির্ভর করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। একই ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল্লামা মুহাম্মদ আশ-শওকানী রহমতুল্লাহু আলায়হ তাঁর *ইরশাদুল ফুহুল* গ্রন্থে, তিনি লিখেছেন,

قَبُولُ رَأْيِي مَنْ لَا تَقْوَمُ بِهِ الْحُجَّةُ بِلا حُجَّةٍ.

‘দলীলবিহীন এমন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা যার কথা গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের কোনো হুজ্জত নেই।’

তাকলীদে ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখা আবশ্যিক। যথা—

১. দীনের মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে অন্যের তাকলীদ করা বৈধ নয়।
২. অকাট্য, সুস্পষ্ট এবং মুতাওয়াতিহ বিষয়ের ক্ষেত্রেও অন্যের তাকলীদে কোনো সুযোগ নেই।
৩. অকাট্য দলীল যদি এমন সুস্পষ্ট হয় যার বিপরীত কোনো দলীল নেই তবে সে ক্ষেত্রেও তাকলীদে কোনো সুযোগ নেই।
৪. যার তাকলীদ করা হয় তাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করা কিংবা তার সুস্পষ্ট ভুল বিষয়কে গুণ্য গোড়ামিবশত আঁকড়ে থাকা শরীয়তসম্মত নয়। ভুল যার থেকেই প্রমাণিত হোক ভুল বিষয়ে তাকলীদ শরীয়তে বৈধ নয়।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য কিংবা একাধিক অর্থপূর্ণ বিষয়ে কাক্ষিত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা মুজতাহিদ রয়েছেন কেবর তাঁদের কথাই গ্রহণযোগ্য নয়, রবং সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদে তাকলীদ করা।

## ইমামের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

### উদাহরণ: ১

কুরআনুল করীমে ইরশাদ হলো,

وَالْبَطْلُ قُلْتُ يَرْكُضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

‘তলাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুর পর্যন্ত উদ্ভত পালন করবে।’<sup>২</sup>

আয়াতে উল্লিখিত কুর শব্দটি আভিধানিকভাবে যৌথ অর্থবোধক। এটি যেমন হায়েয অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি তুহর (পবিত্রতা) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, কুর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঋতুকাল না পবিত্রতার কাল কোন অর্থে ব্যবহৃত হবে।

<sup>১</sup> আশ-শওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল*, খ. ২, পৃ. ২৩৯

<sup>২</sup> আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২:২৮৬

## উদাহরণ: ২

এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَذُرْ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ».

‘হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি মুখাবারা ছেড়ে দেবে না, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল।’<sup>১</sup>

আলোচ্য হাদীসে মুখাবারাহ (বর্গাচাষ) নিষেধ করা হয়েছে। আর অনেক ধরনের মুখাবারাই প্রচলিত আছে। এখন উক্ত হাদীসে কোন ধরনের মুখাবারাহকে নিষেধ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

## উদাহরণ: ৩

এক হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।’<sup>২</sup>

প্রকাশ্যত এ হাদীস ইমাম ও মুক্তাদী একাকী নামায আদায়কারী সবার জন্য নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠ ফরয হওয়া দাবি করছে। কিন্তু আরেক হাদীসে ইরশাদ হলো,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً».

‘কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট, (তাই মুক্তাদীর কিরাআত পড়া ওয়াজিব হয় না)।’<sup>৩</sup>

এ হাদীস মুক্তাদীর কিরাআত ফরয না হওয়া দাবি করছে। এতে উভয় হাদীসের মাঝে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাদীসদ্বয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথম হাদীসটিই আসল বলা হবে, দ্বিতীয় হাদীসে কিরাআত বলে সুরা ফাতেহা নয়। বরং অন্য সুরা বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে হবে। হাদীসদ্বয়ের বিরোধ সমাধানের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, দ্বিতীয় হাদীসকে আসল বলা

<sup>১</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৬২, হাদীস : ৩৪০৬

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫১-১৫২, হাদীস : ৭৫৬

<sup>৩</sup> ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস : ৮৫০

হবে, তবে প্রথম হাদীসে সুরা ফাতেহা পড়া বাধ্যতামূলক হওয়ার যে নির্দেশ রয়েছে তা শুধু ইমাম এবং একাকী নামাযীর জন্য প্রযোজ্য, মুজাদ্দীর জন্য নয়।

উল্লিখিত অবস্থায় আমরা কোন অবস্থায় ওপর আমল করব? কুরআন সুন্নাহর অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যায় এ ধরনের সমস্যা বহু হয়ে থাকে। এ প্রকারের সমস্যাগুলো সমাধানে সম্ভাব্য ২টি পদ্ধতি জ্ঞানসিদ্ধ। যথা—

১. বর্ণিত অবস্থায় আমরা নিজেদের জ্ঞান বিবেকের ওপর নির্ভর করে যে কোন একটি দিক নির্দিষ্ট করে একটি গ্রহণ করত সে মতে আমল করতে থাকবে।
২. নিজের জ্ঞান বিবেকের ওপর নির্ভরতা ছেড়ে আমাদের সম্মানিত পূর্বসূরিগণ এ ধরনের বিষয়ে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা দেখব। তাঁদের মধ্যকার যে মুজতাহিদ তথা গবেষক আলেমের ইলমের ওপর আমরা অধিক আস্থা রাখি তাঁর অভিমতের ওপর আমল করব।

সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়।

ইনসাফের সাথে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে এতে কোন সন্দেহ সংশয় থাকে না যে, উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে প্রথমটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা আমাদের পূর্বসূরিদের ইলম ও তাকওয়ার সাথে আমাদের ইলম ও তাকওয়ার কোন তুলনাই হয় না। নিকৃষ্টতর জাহেল ব্যতীত আর কেউ এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না।

১. মুজতাহিদ ইমামগণ আমাদের চেয়ে রাসূলের যুগের অনেক নিকটবর্তী ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশ এবং কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি লাভ আমাদের তুলনায় তাঁদের জন্য অধিকতর সহজ ছিল।
২. ইজতিহাদকারী ইমামগণকে আল্লাহ তা'আলা যে প্রজ্ঞা এবং ইলম ও স্মৃতিশক্তি দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাঁদের স্মরণশক্তি ও ইলমের সাথে আমাদের স্মরণশক্তি ও ইলমের কোন তুলনা নেই। সর্বদাই তা পরীক্ষা করা যায়।
৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালাম ও তাঁর রাসূলের কথার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য এমন কারো জন্য উন্মোচিত করেন না, যে নাফরমানীতে দৃঢ়। কাজেই কুরআন সুন্নাহর সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য ইলমের সাথে তাকওয়াও অতীব জরুরী।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ইজতিহাদকারী ইমামগণের ইলম এবং তাকওয়ার সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করলেও আকাশ পাতালের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই যে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই এ দুটো পন্থার মধ্য হতে নিজের জ্ঞান

বুদ্ধির ওপর নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে ইজতিহাদকারী ইমামগণের ইলম ও বিবেকের ওপর আস্থা স্থাপন করে সে মোতাবেক আমল করা প্রয়োজন মনে করে। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় তাকলীদ বলা হয়।

তাকলীদ দুই প্রকার। যথা—

১. নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা মুজতাহিদের তাকলীদ না করে একেক বিষয়ে একক ইমামের তাকলীদ করা। একে তাকলীদে মুতলাক বা তাকলীদে গায়রে শখসী তথা অনির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ বলা হয়।
২. নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ করা। সব বিষয়ে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা একে তাকলীদে শখসী তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ বলা হয়।

এই দুই প্রকার তাকলীদের মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ হতে শরীয়তের বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তাকে ইমামদের মধ্য হতে এমন একজনের কথার ওপর নির্ভর করতে হবে, যিনি ইলম ও তাকওয়ার দিক দিয়ে তার নিকট বিশ্বস্ত। এ বিষয়ের বৈধতা এবং অস্তিত্ব কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

### কুরআনের আলোকে তাকলীদ

কুরআনুল করীমে ইমামদের তাকলীদ করার মূল দিকনির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে।

এক. সুরা আন-নিসায় ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

‘হে মুমিনগণ! আমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের।’<sup>১</sup>

আয়াতটিতে উল্লিখিত আমরের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ উল্লিখিত আমরের তাফসীরে বলেছেন, এ দ্বারা শাসক ও বিচারকদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তাফসীরবিদ মনীযীদের এক বৃহৎ দল বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত আমরা দ্বারা ওলামায়ে মুজতাহিদ্দীন তথা গবেষক আলেমগণকে বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ, হাসান আল-বসরী রাঃ, আতা ইবনে আবী রাবাহ রাঃ, আতা ইবনে সাযব রাঃ, আবুল আলিয়া রাঃ প্রমুখ থেকে উল্লিখিত আমরের এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা ৪:৫৯

<sup>২</sup> ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়াযীল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ১৭৪-১৭৯

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী رحمۃ اللہ علیہ তাঁর তাফসীরে কবীরে বর্ণিত তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং এ তাফসীরের আলোকে এ আয়াত তাকলীদের বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল। কেননা তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে ইজতিহাদকারী আলেমদের আনুগত্য করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়ে গেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পদ্ধতি হলো মুজতাহিদ আলেমদের আনুগত্য করা।<sup>১</sup>

উল্লিখিত আলোচনার ওপর আপত্তি তুলে তাকলীদ অস্বীকারকারীরা বলেন, আলোচ্য আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ

‘কোন বিষয়ে যদি তোমরা পরস্পরে মতবিরোধ কর, তা হলে সে বিষয় আল্লাহ তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নাও।’<sup>২</sup>

আয়াতাংশের দাবি হচ্ছে, গবেষক আলেমগণের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে সেখানে কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ আলেমের তাকলীদ না করে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখতে হবে, কোন অভিমত কুরআন সুন্নাহের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। আর দেখার নির্দেশই তাকলীদ নিষেধ করছে।

তাকলীদ অস্বীকারকারীদের উল্লিখিত উক্তির জবাব হচ্ছে, আয়াতের ‘যদি তোমরা পরস্পর মতবিরোধ কর’ অংশে মুজতাহিদদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সর্বসাধারণকে নয়। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোনটি কুরআন সুন্নাহর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল তা তো দেখা একজন মুজতাহিদ আলেমেরই কাজ। তারা দেখবেন বিরোধপূর্ণ বিষয়ের কোনটি কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, তারা সেটাই গ্রহণ করবেন।

প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান رحمۃ اللہ علیہ তাঁর প্রণীত তাফসীরে ফতহুল বায়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ আয়াতাংশে মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব, এ সম্বোধন যখন মুজতাহিদ আলেমদেরকে করা হয়েছে, সুতরাং তাঁদের তাকলীদ তথা অনুসরণে আর কোন আপত্তি থাকছে না।<sup>৩</sup>

দুই. সুরা আন-নিসার অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

<sup>১</sup> ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, খ. ১০, পৃ. ১১২

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা ৪:৫৯

<sup>৩</sup> সিদ্দীক হাসান খান, ফতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৬০

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ

‘আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত অথবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। যদি তারা সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল কিংবা তাদের কর্তৃত্বশীলদের পর্যন্ত তাহলে যারা অনুসন্ধান করেন, তারা তা অনুধাবন করতেন।’<sup>১</sup>

এ আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যুদ্ধকালে মুনাফিকরা বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে দিত। সহজ-সরল মুসলমানরা মুনাফিকদের এই গুজবে বিশ্বাস করে তা অন্যত্র ছড়িয়ে দিত। এভাবে সমগ্র লোকালয়ে বিভ্রান্তিকর গুজবে ছড়িয়ে পড়ত। এতে বিশৃঙ্খলা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হত। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত কোন গুজব শুনলে তা প্রচারের আগে ফকীহ সাহাবীগণের সাথে আলাপ করা। তাহলে তাঁরা এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যথাযথ কর্মপন্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী মোহতাজ আলিয়াহ তাফসীরে কবীরে এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস মোহতাজ আলিয়াহ আহকামুল কুরআনে তাকলীদ শরীয়তসম্মত বিষয় হওয়ার দলীল হিসেবে এ আয়াত উপস্থাপন করেছেন।<sup>২</sup>

যদিও তাকলীদ বিরোধীরা তাকলীদের স্বপক্ষে এ আয়াত অনেক দূর্বর্তী বলতে চান, তবে তাকলীদ বিরোধীদের নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান খান মোহতাজ আলিয়াহ তাঁর তাফসীরে ফাতহুল বায়ানে এ আয়াতকে কিয়াস বৈধ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যদি এ আয়াত দিয়ে কিয়াসকে শরীয়তের দলীল প্রমাণ করা দূর্বর্তী না হয়, তাহলে এ আয়াত দিয়ে তাকলীদ জায়েয হওয়া প্রমাণ করাটা দূর্বর্তী হবে কেন?<sup>৩</sup>

তিন. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۖ

‘তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না যাতে তারা দিনের জ্ঞান লাভ করবে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করবে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সচেতন হতে পারে।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা ৪:৮৩

<sup>২</sup> (ক) ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, খ. ১০, পৃ. ১১২; (খ) আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ২৬৪-২৬৫

<sup>৩</sup> সিদ্দিক হাসান খান, ফতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৬০

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯:১২২

এ আয়াতে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, সবাই এক কাজে ব্যস্ত হওয়া অনুচিত। বরং কিছু লোক জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে আর কিছু লোক দীনি ইলম শিক্ষা করবে। অতঃপর যারা ইলম শিক্ষা করবে তারা মুজাহিদদেরকে মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দিবে। তাই মুজাহিদগণ যাদের থেকে শিখবে তাদের মান্য করবে এবং এ মানার নামই তাকলীদ (অনুসরণ)।

চার. আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

‘তোমরা যদি কোন বিষয় না জান, তা হলে যারা জ্ঞানবান তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।’<sup>১</sup>

এ আয়াতে মৌলিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যারা জানে না তারা যেন যারা জানে তাদের স্মরণাপন্ন হয়। যদিও এ আয়াত আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রেও ঘটনার বিশেষত্ব নয়, শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য এ মূলনীতি মোতাবেক এ কর্মনীতি প্রমাণিত হয় যে, যিনি আলেম নন তিনি কোন বিষয় জানার প্রয়োজন আলেমের শরণাপন্ন হবেন। আর এরই নাম তাকলীদ।

হাদীসের আলোকে তাকলীদ

১. জামি তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أَذْرِي مَا قَدَرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي» وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

‘হযরত হুযায়ফা রাঃ এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘আমি জানি না আর কত কাল তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকব, সুতরাং আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং ওমর রাঃ এর অনুসরণ করবে।’<sup>২</sup>

এ হাদীসে ইকতিদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কোন ব্যবস্থাপনাজনিত বিষয়ে কারো আনুগত্যের নির্দেশ দানে ইকতিদা শব্দের ব্যবহার হয় না। বরং দীনি বিষয়ে আনুগত্যের নির্দেশকালেই ইকতিদা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩

<sup>২</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৬১০, হাদীস : ৩৬৬৩ ও পৃ. ৬৬৮, হাদীস : ৩৭৯৯; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৮, পৃ. ৩১০, হাদীস : ২৩২৭৬, পৃ. ৩৯৯, হাদীস : ২৩৩৮৬ ও পৃ. ৪১৮, হাদীস : ২৩৪১৯; (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৭, হাদীস : ৯৭

২. সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, নামাযে ইমামের পিছনের ব্যক্তির ইমামের, আর তাদের পিছনের ব্যক্তির তাদের অনুসরণ করবে। কোন কোন সাহাবী জামাতে দেবী করে আসতে শুরু করেন। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে আগে এসে প্রথম কাতারে নামায পড়ার তাকিদ দেন এবং একই সাথে বলেন প্রথম কাতারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দেখে তাঁর ইকতিদা করবে।

৩. মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফে ইমাম বায়হাকী আলায়াহ ও আল-মাদখাল গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَاتِّحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ».

‘ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আল-আযরী আলায়াহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ আলায়াহ ইরশাদ করেন, এই ইলম ধারণ করবে প্রতি প্রজন্ম থেকে নিষ্ঠাবান লোকেরা, যারা তা থেকে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের প্রতারণা ও মূর্খদের অপব্যখ্যা অপসারিত করবে।’

এ হাদীসে জাহেলদের কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার নিন্দা করা হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে, জাহেল ও বাতিলপন্থীদের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রতিরোধ করা হক্কানী আলেমদের অবশ্য কর্তব্য। যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের নিজ বিবেকের ওপর নির্ভর করে কুরআন সুন্নাহের ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। বরং দীনি বিষয়সমূহে ইমামদের মতামত গ্রহণ করা উচিত। আর তাঁদের মতামত গ্রহণ করাকে তাকলীদ বলে।

## সাহাবা যুগে তাকলীদ

সাহাবায়ে কেরামের যমানায় ইজতিহাদের দৃষ্টান্তের সাথে সাথে তাকলীদের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সকল সাহাবী সরাসরি কুরআন থেকে মাসআলা বের করতে পারতেন না, তাঁরা অভিজ্ঞ ফকীহ সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন। ফকীহ সাহাবীগণ তাঁদের মাসআলার জবাব দু’ভাবেই দিতেন। কখনও দলীল উল্লেখ করে আবার কখনও বা দলীল উল্লেখ ছাড়া। যদিও সেযুগে

<sup>১</sup> (ক) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৮২, হাদীস : ২৪৮ (৫১); (খ) আল-বায়হাকী, দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত, খ. ১, পৃ. ৪৪; (গ) ইবনুল হাজ, মদখালুশ শর’ই আশ-শরীফ, খ. ৪, পৃ. ২৫৩



ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাকলীদের প্রয়োজন অনুভব করা হত না, তবুও তখন তাকলীদে মুতলাক (সাধারণ তাকলীদ) ও তাকলীদে শখসী (নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ) উভয় প্রকারই প্রচলিত ছিল। তাকলীদে মুতলাকের দৃষ্টান্ত সে যমানায় অনেক। কেননা সকল ফকীহ সাহাবী নিজ নিজ মহলে ফতোয়া দিতেন এবং অন্যরা তাঁর তাকলীদ করতেন তথা ফতোয়া মেনে নিতেন। যেমন- ইমাম ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহমাহুল্লাহ ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন কিতাবে লিখেন, পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্য থেকে ১৩০ জনের উর্ধ্বে ফতোয়া প্রদানকারী পাওয়া যায়। এ সকল মুফতীর ফতোয়াসমূহ তাকলীদে মুতলাকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।<sup>১</sup>

এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহাবীগণের শুধু কথার তাকলীদই করা হত না। আমলেরও তাকলীদ করা হত। যেমন- মুওয়াত্তা মালিকে বর্ণিত আছে,

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَّصْبُوعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوعُ يَا طَلْحَةُ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ مَدْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَتُمَّةٌ يَفْتَدِي بِكُمْ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمَصْبُغَةَ فِي الْإِحْرَامِ، فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمَصْبُغَةِ.

‘হযরত নাফি’ রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমাহুল্লাহ-এর সেবক আসলাম রহমাহুল্লাহ থেকে শুনেছেন, তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রহমাহুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমাহুল্লাহ তালহা রহমাহুল্লাহ-কে ইহরাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিহিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাবে বললেন, এ কাপড়ে সুগন্ধ নেই। একথা শুনে ওমর রহমাহুল্লাহ বললেন, হে তালহা! তোমরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। অতএব যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি, তোমার পরিধানে এ ধরনের কাপড় দেখে তা হলে বলবে, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ইহরামে রঙিন কাপড় পরিধান করতেন। ওমর রহমাহুল্লাহ বলেন, তাই আমি তোমাদেরকে বলছি, ইহরাম অবস্থায় এ ধরনের কাপড় পরিধান করো না।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন-রাব্বিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ১০

<sup>২</sup> মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াত্তা, খ. ১, পৃ. ৩২৬, হাদীস : ১০

## সাহাবা যুগে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ

সাহাবা যুগে ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাকলীদেরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।  
নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

১. সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ রাযাঃ আনহু، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ  
حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدْعُ قَوْلَ زَيْدٍ.

‘হযরত ইকরামা রাযাঃ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসী ইবনে আব্বাস রাযাঃ আনহু-কে সে মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, যে তওয়াফের পর ঋতুবতী হয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, সে চলে যাবে। তখন তাঁরা বললেন, আমরা যায়দ রাযাঃ আনহু-এর মত ছেড়ে আপনার মত গ্রহণ করব না।’<sup>১</sup>

এ রিওয়াযাতিটি মুজামে ইসমাঈলে আবদুল ওয়াহহাব আস-সাকাফী রাযাঃ আনহু-এর সনদে বর্ণিত আছে। তাতে মদীনাবাসীর বক্তব্য এরূপ: আমরা আপনার ফতোয়া দেয়া না দেয়ার পরোয়া করি না। কেননা যায়দ ইবনে সাবিত রাযাঃ আনহু বলেছেন, ‘মহিলা ফিরে যাবে না।’

মুসনদে আবু দাউদ আত-তায়ালিসীতে এভাবে বর্ণিত আছে,

لَنْ تُتَابِعَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا.

‘হে ইবনে আব্বাস! আমরা আপনার অনুসরণ করব না। কেননা আপনি উক্ত মাসআলায় যায়দ রাযাঃ আনহু-এর সাথে মতবিরোধ করেছেন।’<sup>২</sup>

উক্ত ঘটনায় এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল, মদীনাবাসী হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযাঃ আনহু-এর তকলীদ করতেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযাঃ আনহু-এর মতো একজন উচ্চস্তরের সাহাবীর ফতোয়া কবুল করেননি। ফতওয়া প্রত্যাখান করার কারণ হিসেবে তাঁরা শুধু এতটুকুই বলেছেন, তাঁর ফতওয়া যায়দ রাযাঃ আনহু-এর ফতোয়ার বিপরীত। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযাঃ আনহু একথা বলেননি, তোমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ করে গুনাহ কিংবা শিরক করেছে। বরং তিনি বলেছেন, আমি হযরত উম্মে সুলাইম রাযাঃ আনহু-এর নিকট থেকে

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৮০, হাদীস : ১৭৫৮

<sup>২</sup> আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল-মুসনদ, খ. ৩, পৃ. ২২৩, হাদীস : ১৭৫৬

মাসআলা পুনঃঅনুসন্ধান করে যায়েদ ইবনে ছাবেতের নিকট যাব। এমনটিই হলো। ফলে হযরত যায়দ রাঃ সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে অনুসন্ধানী পর্যালোচনা শেষে নিজের ফতোয়া থেকে সরে আসেন। যেমন- সহীহ মুসলিম শরীফের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মদীনাবাসী ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ করতেন।

২. সহীহ আল-বুখারীতে হযরত হুযায়ল ইবনে শুরাহবীল রাঃ থেকে বর্ণিত,  
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنْ بَنَاتِ بْنِ وَأَخْتِ، فَقَالَ: لِبَنَاتِ النَّصْفِ،  
 وَلِلْأَخْتِ النَّصْفِ، وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَسَيَّأُ بَعْضِي، فَسَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ،  
 وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،  
 أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلْبَنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْبَنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ  
 الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ،  
 فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

‘হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ-এর নিকট কতিপয় ব্যক্তি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর নিকট থেকে আরও জেনে নিও। লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর নিকট গিয়ে আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ-এর অভিমত উল্লেখ করলেন। ইবনে মাসউদ রাঃ যে ফতোয়া দেন, তা আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ-এর বিপরীত ছিল। লোকজন আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ-এর নিকট হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ-এর ফতোয়ার কথা উল্লেখ করলে আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ বললেন, এ মহাজ্ঞানী যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আছেন ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না।’<sup>১</sup>

মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত আছে, মুসনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এ উল্লেখ রয়েছে যে,

«لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْخَبْرُ يُرَى أَظْهَرَ كُمْ».<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৫১, হাদীস : ৬৭৩৭

<sup>২</sup> আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৭, পৃ. ৪২৬, হাদীস : ৪৪৬০

এখানে হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ তাদেরকে পরামর্শ দিলেন, সকল মাসআলা ইবনে মাসউদের নিকট জিজ্ঞেস করবে। আর এটাকেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাকলীদ বলা হয়।

৩. সুনানে আবু দাউদ, জামি তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত আছে, নবী করীম সঃ মুআয ইবনে জাবাল রাঃ কে ইয়ামানে পাঠানো প্রাক্কালে তাঁকে শরয়ী বিধানের উৎস সম্পর্কে বলে দেন। মুআয ইবনে জাবাল রাঃ ইয়ামানে কেবল গভর্নর হয়েই যাননি। বরং মুফতী এবং বিচারক হিসেবেও গিয়েছিলেন। এ কারণে ইয়ামানবাসীদের জন্যে তাঁর তাকলীদ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ফলে তাঁরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাকলীদ করতে শুরু করেন।<sup>১</sup>

এখানে কোন কোন গাইরে মুকাল্লিদ বলেন, মুআয ইবনে জাবাল রাঃ বিচারক ছিলেন মুফতী ছিলেন না। তাদের এহেন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ আল-বুখারী বর্ণিত আছে,

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَآمِرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ: تُوْفِّي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ.

‘হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াবদী রাঃ থেকে বর্ণিত, মুআয ইবনে জাবাল রাঃ ইয়ামানে আমাদের নিকট শিক্ষক ও আমীর হয়ে আসেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি একটি মেয়ে ও এক বোন রেখে মারা গেল। তার ত্যাজ্য সম্পত্তি কাকে কতটুকু দিতে হবে? তিনি বললেন, মাইয়েতের সম্পত্তির অর্ধেক মেয়েকে আর বাকী অর্ধেক বোনকে দিতে হবে।’<sup>২</sup>

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি মুফতী হিসেবে তাদেরকে ফতোয়াও দিতেন। উক্ত মাসআলায় তিনি ফতোয়ার স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করেননি। ইয়ামানবাসী তা তাকলীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মোটকথা সাহাবা যুগে উভয় প্রকারের তাকলীদের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূলত তাকলীদের উভয় প্রকারই জায়েয এবং প্রথম যমানায় নির্দিধায় উভয় প্রকারের উপরই আমল চলছিল। কিন্তু পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এক বিরাট

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস : ৩৫৯২; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৬০৮, হাদীস : ১৩২৭

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৫১, হাদীস : ৬৭৩৪

সুশৃঙ্খল কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে তাকলীদে মাতলাকের পরিবর্তে তাকলীদে শখসীর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাকলীদে মুতলাকের খোলাখুলি অনুমতি দিলে প্রবৃত্তির অনুসরণে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হতো। এ কারণে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ওলামায়ে কেরাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার অভিমত প্রকাশ করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী প্রশ্নোত্তর আলিয়াহ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে আলেমগণের এ সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার পর লিখেন, এটিই এ যামানায় ওয়াজিব ছিল।

এখন প্রশ্ন যে বিষয়টি সাহাবা যুগ ওয়াজিব ছিল না, তা পরবর্তীতে ওয়াজিব হয় কিভাবে? আল-ইনসায়ফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ গ্রন্থে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী প্রশ্নোত্তর আলিয়াহ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, ওয়াজিব দুই প্রকার। যথা— ১. সত্তাগত ওয়াজিব ও ২. অন্যের কারণে বা প্রাসঙ্গিক ওয়াজিব।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে সকল ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে কিছু বর্জন করা যাবে না। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে কোন যামানায় হয়ত একটি মাত্র রাস্তা খোলা থাকে, তখন সে পদ্ধতিকেই গ্রহণ করা ওয়াজিব। যেমন— সাহাবা যুগে হাদীস সংরক্ষণ ওয়াজিব ছিল, কিন্তু লিপিবদ্ধকরণ ওয়াজিব ছিল না। কেননা সংরক্ষণের দায়িত্ব মুখস্থ রাখলেই আদায় হয়ে যেত, কিন্তু যখন থেকে স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ব্যবস্থার ওপর থেকে আস্থা কমে গেল, তখন থেকে লেখার মাধ্যম ছাড়া হাদীস সংরক্ষণের অন্য কোন পদ্ধতিই বাকী রইল না। এ কারণে তখন থেকে হাদীস লিখে রাখা ওয়াজিব হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবয়ীদের যুগে যাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন না, তাঁদের জন্যে তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব ছিল। কিন্তু যখন থেকে তাকলীদে মুতলাক বিপজ্জনক হয়ে গেল, তখন থেকে কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদই ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো।

হযরত ওসমান রিয়াদাতুল আনব-এর পূর্বে কুরআন করীম যে কোন রসমুল খত তথা লিখন পদ্ধতিতে লিখা জায়েয ছিল, কিন্তু হযরত ওসমান রিয়াদাতুল আনব একটি কঠিন ফিতনার দরজা বন্ধ করার জন্যে সমস্ত উম্মতকে এক পদ্ধতির ওপর একত্র করেছেন এবং অন্য পদ্ধতি না-জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর ওপর উম্মতের ঐক্যও হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করতে পারেনি, কেন তিনি ওয়াজিব নয় এমন একটি বিষয় ওয়াজিব করে দিয়েছেন? ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদের ব্যাপারটাও অনুরূপ। ভয়াবহ ফাসাদ-ফেতনার দরজা বন্ধ করার জন্যে এটা ওয়াজিব করা হয়েছে। তা না হলে প্রতি পাড়ায়-মহল্লায় প্রতিটি স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে দিন দিন মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, মারামারি ও হানাহানি বৃদ্ধি পাবে।

## তাকলীদের স্তর

এ পর্যন্ত সাধারণভাবে তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করা হলো। তবে তাকলীদ জ্ঞানগত যোগ্যতা হিসেবে তাকলীদ বিভিন্ন স্তর বিন্যাস হয়। এ স্তরগুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে কোন কোন সময় এতে অতিরঞ্জন ও ত্রুটি দেখা দেয়। তাই স্মরণ রাখতে হবে, তাকলীদের স্তর ৪টি। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

### ১. জনসাধারণের তাকলীদ

সাধারণ লোক বলতে তিন ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে।

১. সে সকল লোক যারা আরবী ও ইসলামী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অন্য বিষয়ে যতই পারদর্শী হোক না কেন।
২. এসব লোক যারা আরবী ভাষা ভালোভাবেই জানে, কিন্তু যথানিয়মে জ্ঞান অর্জন করেনি।
৩. এমন আলেম, যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ঠিকই, কিন্তু দীনি ইলমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হননি। এ তিন প্রকারের একই হুকুম সর্বাবস্থায় তাদের ওপর তাকলীদ ওয়াজিব। এরা নিজ ইমাম ও মুফতীর অভিমতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারবে না। যদিও তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়।

তবে কোন মুফতী যদি ভুল ফতোয়া দেয় যে, শিংগা লাগালে রোযা ভেঙে যায়, আর তার কথায় কিছু খেয়ে নেয়, তা হলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। এর কারণ হিসেবে বলেন, ‘সাধারণ লোকের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে ফকীহগণের অনুকরণ করা ওয়াজিব ছিল।’<sup>১</sup>

### ২. গভীর জ্ঞানী আলেমের তাকলীদ

গভীর জ্ঞানী আলেম বলতে আমরা সে সকল আলেম বুঝি, যারা ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছতে পারেনি, তবে কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা ও গভীর পাণ্ডিত্য রয়েছে। কমপক্ষে আপন মাযহাবের মাসআলাসমূহ তাঁদের সদা স্মরণ ও দলীল-যুক্তি সহকারে জানা রয়েছে। এমন ব্যক্তির তাকলীদ সাধারণ লোকের তাকলীদের চেয়ে অনেকটা ভিন্নতর। নিম্নে এ উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা হলো:

১. তিনি নিজ ইমামের মাযহাবে একাধিক অভিমত থাকলে কোন একটিকে প্রাধান্য অথবা সব কটির মধ্যে সামঞ্জস্যবজায় রাখার মত জ্ঞান রাখেন।
২. যে মাসআলায় ইমামের স্পষ্ট কোন মত নেই, সে ক্ষেত্রে ইমামের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে হুকুম বের করতে পারবেন।

<sup>১</sup> আল-মারগীনালা, আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, খ. ১, পৃ. ২২৬

৩. ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা ও কঠিন প্রয়োজনে কোন কোন সময় অন্য মুজতাহিদের মত অনুযায়ীও ফতওয়া দিতে পারবেন। তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে, যার বর্ণনা উসূলে ফতোয়া তথা ফতোয়ার মূলনীতি শাস্ত্রের কিতাবে বর্ণিত আছে।
৪. এমন ব্যক্তির নিকট যদি ইমামের মতামত কোন সহীহ স্পষ্ট হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয় এবং সে হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয় এবং সে হাদীসের বিপরীত অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যায়, আর ইমামের কথার ব্যাপারে অন্তর পরিষ্কার না হয়, তা হলে এমতাবস্থায় তিনি ইমামের কথা বাদ দিয়ে হাদীসের ওপর আমল করবেন। যেমন নাকি মুযারাআ (কৃষিকার্য) সম্পর্কে কিছু মাসআলা হানাফী শায়খগণ ইমাম আবু হানিফা رحمۃ اللہ علیہ আলোয়াইহ-এর মত ছেড়ে দিয়েছেন। অনুরূপ চার প্রকার শরাব ব্যতীত অন্য শরাবে নেশার পরিমাণের চেয়ে কম পান করা শক্তি অর্জনের জন্যে জায়েয। এটা ইমাম আবু হানিফা رحمۃ اللہ علیہ আলোয়াইহ-এর মত। কিন্তু হানিফী আলেমগণ স্পষ্ট সহীহ হাদীসের কারণে তাঁর অভিমত ছেড়ে দিয়েছেন।

### ৩. মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ

তাকলীদের তৃতীয় স্তর হলো মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তালকীদ। মুজতাহিদ ফিল মাযহাব সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ইজতেহাদে মুতলাকের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাযহাবের দলীলের মূলনীতি নিজে রচনা করতে পারেন না, তবে দলীলের মূলনীতির আলোকে হুকুম-আহকাম বের করতে সক্ষম। এমন ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি মুকাল্লিদ এবং শাখা মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ হন।

### ৪. মুজতাহিদে মুতলাকের তাকলীদ



তাকলীদের শেষ স্তর মুজতাহিদে মুতলাকের তাকলীদ। যিনি নিজে মুজতাহিদে মুতলাক, তাঁকে অনেক সময় অন্যের তাকলীদও করতে হয়। অর্থাৎ এমন স্থানে, যেখানে কুরআনে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণ সাধারণত কিয়াস ও আপন অভিমতের ওপর আমল করার পরিবর্তে পূর্বকার আলেমগণের কারো অভিমত গ্রহণ করে থাকেন। যেমন- ইমাম আবু হানিফা رحمۃ اللہ علیہ সাধারণভাবে ইমাম ইবরাহীম আন-নাখরী رحمۃ اللہ علیہ আলোয়াইহ-এর অনুসরণ করতেন। ইমাম শাফিয়ী رحمۃ اللہ علیہ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে জুরাইজ رحمۃ اللہ علیہ আলোয়াইহ-এর, ইমাম মালেক رحمۃ اللہ علیہ মদীনীর যে কোন একজন ফকীহের অনুসরণ করতেন।

## মাযহাব চতুষ্ঠয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঐতিহাসিক তথ্যমতে হিজরী ১৩২ সাল থেকে গঠনমূলকভাবে ইলমুল ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। এরপর কাছাকাছি সময়ে এ কাজে বহুসংখ্যক আলিম প্রাণ-পণ চেষ্টা চালিয়ে বহু মাযহাবের জন্ম দেন। কিন্তু কালের বিচারে এসব মাযহাবের প্রায় সবই গ্রহণযোগ্যতা হারায়। টিকে থাকে কেবল চারটি মাযহাব: ১. হানাফী মাযহাব, ২. মালিকী মাযহাব, ৩. শাফিয়ী মাযহাব ও ৪. হাম্বলী মাযহাব।

শত চিন্তা-গবেষণার পর মুসলিম ঐক্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তৎকালীন অধিকাংশ মুজতাহিদ আলিম ‘চারটি মাযহাবই সত্য ও অনুসরণীয়’ একথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমের ইজমা হয়। এক্ষেত্রে আহলে হাদীসগণ দ্বিমত পোষণ করেন এবং তারা মাযহাব না মানার জন্যে বিশ্ব মুসলিমের প্রতি জোরালো দাবি উত্থাপন করেন। ফলে, বিশ্ব মুসলিমের একটা অংশ তাদের পক্ষ সমর্থন করে এবং তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ। বাকি মুসলিম বিশ্ব মাযহাবের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিম্নে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো,

### ১. হানাফী মাযহাব

ইমাম আবু হানিফা  এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর উপনাম আবু হানিফা  ‘হানিফা’ শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম দেয়া হয় হানাফী মাযহাব। নিম্নে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

**পরিচিতি:** নাম নু’মান, উপনাম আবু হানিফা। এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। পিতার নাম সাবিত। তিনি একজন তাবিয়ী ছিলেন।

**জন্ম:** তিনি হিজরী ৮০ মুতাবিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।

**বংশধর:** আবু হানিফা নু’মান ইবনে সাবিত ইবনে যুতী’আত-তায়মী।



কারো মতে, তাঁর দাদা যুতা' ছিলেন কাবুলের অধিবাসী এবং বনু তাইমুল্লাহ ইবনে সা'লাবার ক্রীতদাস। তাঁরা তাঁকে আযাদ করার পর তাঁর পিতা সাবিত স্বাধীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ সর্বদা আযাদই ছিলেন, কখনো ক্রীতদাস ছিলেন না। সাবিত ছোটবেলায় হযরত আলী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ-এর খেদমতে আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর ও তাঁর বংশধরের জন্যে বরকতের দোয়া করেন।

**বাল্যকাল:** তিনি বাল্যকাল হতেই তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। পরে একজন বিশিষ্ট আলিমের পরামর্শে জ্ঞানার্জনের উৎসাহ লাভ করেন। এক সময় মহানবী সَلَّمَ اللہُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-এর একান্ত খাদেম ও প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী কূফায় আগমন করলে তিনি অল্প বয়সে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তৎকালীন কূফায় প্রথানুযায়ী বিশ বছরের পূর্বে হাদীস বর্ণনার সুযোগ না থাকায় তিনি তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি। তবে তাঁকে দেখে বাল্য বয়সেই তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

**শিক্ষা জীবন:** তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইলমুল কালামে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন। তিনি হাদীস, তাফসীর, নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করে ছিলেন।

**গুণাবলি:** ইমাম আবু হানিফা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বিশিষ্ট আবিদ এবং অতিশয় বুদ্ধিমান। তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। ইবাদত-বন্দেগীতে রজনী কাটিয়েছেন। প্রতি রমযানে ৬১ বার কুরআন মজীদ খতম করতেন। অনেক সময় এক রাকাতেই কুরআন মজীদ এক খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় কা'বা শরীফে দু'রাকাত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাকাতে এক পা ওঠিয়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআন মজীদ পাঠ করেন, তারপর দ্বিতীয় রাকাতাতে অপর পা ওঠিয়ে বাকী অর্ধাংশ কুরআন পাঠ করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে সেখানে এক হাজার বার কুরআন মজীদ খতম করেছেন।<sup>১</sup> তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন।

তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও খোদাভীরু ছিলেন। একদিন কূফায় ছাগল চুরি হয়ে গেলে তিনি সাত বছর পর্যন্ত ছাগলের গোশত বক্ষণ করেননি। কেননা,

<sup>১</sup> মিস্যতাহ্‌স সাআদা

ছাগলের বয়স সাত বছর হয়ে থাকে।<sup>১</sup> তাঁর ইবাদতের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত ইশার নামাযের অযু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করেছেন। তিনি প্রতি মাসে কুরআন মজীদ ষাট খতম দিতেন।

তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি: তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন—

১. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ (যিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন) বলেন,

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَغَاثَنِي بِأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ كُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ.

‘আব্দুল্লাহ তা’আলা যদি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহিমাহুল্লাহ দ্বারা আমাকে সহায়তা না করতেন, তবে আমি অন্যান্য মানুষের মত থাকতাম।’<sup>২</sup>

২. ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

النَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفَقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

‘মানুষ ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর পরিবার।’<sup>৩</sup>

৩. তিনি অন্যত্র বলেন,

مَنْ أَرَادَ الْفَقْهَ فَعَلَيْهِ بِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

‘যে ব্যক্তি ফিকহ শাস্ত্র শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ছাত্রদেরকে আকড়ে ধরে।’<sup>৪</sup>

৪. হযরত ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন,

أَفْقَهُ النَّاسُ أَبُو حَنِيفَةَ، مَا رَأَيْتُ فِي الْفَقْهِ مِثْلَهُ.

‘মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহ বিশারদ হলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, আমি ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ন্যায় যোগ্য কাউকে দেখিনি।’<sup>৫</sup>

৫. হযরত ইবনে মঈন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

<sup>১</sup> মিফতাহুস সাআদা

<sup>২</sup> ইবনে হাজর আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪৫০; হযরত আবু ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে মাযাহিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

<sup>৩</sup> আল-খতীবুল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ. ২২, পৃ. ৮২

<sup>৪</sup> আল-খতীবুল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ. ২২, পৃ. ৫১

<sup>৫</sup> ইবনে হাজর আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪৫০; হযরত আবু ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে মাযাহিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ.

‘ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি হাদীসে সেকাহ (বিশ্বস্ত) ছিলেন।’<sup>১</sup>

৬. হযরত সুলায়মান ইবনে আবু শায়খ বলেন,

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرَعًا سَخِيًّا.

‘ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি একজন বুয়ুর্গ ও দাতা ছিলেন।’<sup>২</sup>

৭. হযরত আবু নুয়াইম রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ صَاحِبَ عَوْصٍ فِي الْمَسَائِلِ.

‘ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি মাসআলায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।’<sup>৩</sup>

৮. হযরত আহমদ ইবনুস সাব্বাহ রাহমতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণিত,

سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: قِيلَ لِمَالِكٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَبَا حَنِيفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ،  
رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَك فِي هَذِهِ السَّارِيَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِحُجَّتِهِ.

‘ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইমাম মালিক রাহমতুল্লাহি আলায়হি-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কি ইমাম আবু হানীফ রাহমতুল্লাহি আলায়হি-কে দেখেছেন?’ তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘হ্যাঁ! আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এ স্তম্ভটিকে স্বর্ণ বলে সাব্যস্ত করতে চান, তবে যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে পারেন।’<sup>৪</sup>

সাহাবীর দর্শন লাভ: তিনি একাধিক বার প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সুতরাং তিনি তাবিয়ী, ইমাম হাফয ইবনে হাজার মক্কী রাহমতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইবনে জওয়াই রাহমতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম দারে কুতনী রাহমতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখের মতে, তিনি হযরত আনাস রাহমতুল্লাহি আলায়হি ছাড়াও আরও কতিপয় সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য যে, তখন চারজন সাহাবী জীবিত ছিলেন:

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাহমতুল্লাহি আলায়হি কূফায়,
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি কূফায়,
৩. হযরত সাহ ইবনে সা’দ রাহমতুল্লাহি আলায়হি মদীনায় ও
৪. আবু তুফায়িল আমর ইবনে ওয়াসিলা রাহমতুল্লাহি আলায়হি মক্কায়।

<sup>১</sup> আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুব্বা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫; হযরত সালিহ ইবনে মুহাম্মদ রাহমতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪৫০

<sup>৩</sup> আন-নাওয়াযী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, খ. ২, পৃ. ২২০

<sup>৪</sup> আয-যাহাবী, *মুনাক্কিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহাবায়হি*, পৃ. ৩১

**ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান:** তিনি ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর চল্লিশ জন সুদক্ষ ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ‘ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড’ গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ফিকহ শাস্ত্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। বোর্ডের চল্লিশ জন সদস্য থেকে আবার দশ জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকহ শাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ বিশেষ বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। বোর্ডের সামনে কোন একটি মাসয়ালা পেশ করা হত। অতঃপর সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা লিপিবদ্ধ করা হত। এভাবে ৮৩/৯৩ হাজার মাসয়ালা ‘কুতুবে হানাফিয়াতে’ লিপিবদ্ধ করা হয়।

**হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান:** তিনি ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করার দরুন হাদীসশাস্ত্রে তেমন অবদান রাখতে পারেন নি। ইমাম যুরাকী رحمہ اللہ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন— ৫০০, ৬০০, ৭০০, ১১০০।

**বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা:** খলীফা মনসুর তাঁকে কূফা হতে বাগদাদে ডেকে এনে ইরাকের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে প্রথমে অনুরোধ করে, পরে চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু ইমাম আযম সাহেব তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে তাঁকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয় এবং দশ দিন যাবত দৈনিক দশটি করে চাবুকও মারা হয়।

**শিক্ষকবৃন্দ:** তাঁর ৪ হাজারের অধিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মধ্যে ৯৩ জন তাবেয়ী, বাকী ৭ জন সাহাবী ও আহলে বায়ত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন: ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ رحمہ اللہ, ইমাম আসিম ইবনে আবু নুজুদ رحمہ اللہ, ইমাম আলকামা ইবনে মারসাদ رحمہ اللہ, ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান رحمہ اللہ, ইমাম হাকাম ইবনে ওতাইবা رحمہ اللہ, ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল رحمہ اللہ, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী رحمہ اللہ, ইমাম আলী ইবনে আকরাম رحمہ اللہ, ইমাম যিয়াদ ইবনে আলকাহ رحمہ اللہ, ইমাম সাঈদ ইবনে মাসরুফ সাওফী رحمہ اللہ, ইমাম আদী ইবনে সাবিত আনসারী رحمہ اللہ, ইমাম আবু সুফিয়ান সা’দ رحمہ اللہ, ইমাম হিশাম ইবনে ওরওয়া رحمہ اللہ প্রমুখ।

**ছাত্রবৃন্দ:** তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণ হলেন ইমাম আবু ইউসুফ رحمہ اللہ, ইমাম মুহাম্মদ رحمہ اللہ, ইমাম যুফার رحمہ اللہ, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ رحمہ اللہ, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ رحمہ اللہ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক رحمہ اللہ, ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস رحمہ اللہ, ইমাম যাকারিয়া ইবনে আবু যায়িদা رحمہ اللہ, ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা رحمہ اللہ, ইমাম ঈসা ইবনে ইউনুস رحمہ اللہ, ইমাম খারিজা ইবনে মুসয়াব رحمہ اللہ, ইমাম মুসয়াব ইবনে মিকদাম رحمہ اللہ, ইমাম আবু আসিম رحمہ اللہ প্রমুখ।


রচনাবলি: তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো: ১. مُسْنَدُ أَبِي  
إِسْمَاعِيلَ ২. حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ ৩. حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ ৪. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ৫. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ৬. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ৭. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ৮. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ৯. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ১০. حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ

কারো কারো মতে, তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর শিষ্যদের রচিত গ্রন্থাবলিকে তাঁর নামে চালানো হয়েছে।

**ইত্তিকাল:** তিনি হিজরী ১৫০ সন মুতাবিক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মনসূর কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার ফলে কারাগারে ইত্তিকাল করেন।

তাঁর জানাযায় এতলোক একত্রিত হয়েছিল যে, পাঁচ বার জানাযা পড়তে হয়েছিল। তাঁর জানাযার সর্বশেষ ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাম্মাদ। তাঁকে গোসল দেন কুফার প্রধান কাযী হাসান ইবনে ওমারা <sup>মোহাম্মাদ আলিয়াহ</sup>। তাঁকে খাইয়ারান নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

## ২. মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক ইবনে আনাস  এ মায়হাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারে মায়হাবের নামকরণ হয় ‘মালিকী মায়হাব।’ তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম-মালিক, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরত। পিতার নাম আনাস।

বংশধারা: আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমর ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে ওসমান (মতান্তরে গাইমান) ইবনে জুসাইল ইবনে আমর ইবনে হারিস যিল আসাবাহ আল-আসবাহী।

**জন্মগ্রহণ:** ইমাম মালিক ইবনে আনাস <sup>রুমি ইমাম হি</sup> ৯৩ হিজরীতে মদীনায়ে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাতৃগর্ভে তিন বছর ছিলেন।

**শিক্ষা জীবন:** তৎকালীন সময়ে মদীনা ছিল কুরআন ও হাদীস শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। এটি হলো, মহানবী <sup>ﷺ</sup> -এর প্রিয় শহর। মহানবী <sup>ﷺ</sup> ও সাহাবীগণ ইস্তিকাল করলেও তাঁদের বংশধরের অধিকাংশ এখানেই বসবাস করেন। অতঃপর ইমাম যুহরী <sup>رحمہ اللہ</sup> আলোয়াই, নাফে <sup>رحمہ اللہ</sup> আলোয়াই, ইবনে যাকওয়ান <sup>رحمہ اللہ</sup> এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ <sup>رحمہ اللہ</sup> -এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। হিজায়ের ফকীহ, রবীয়াতুর রায় <sup>رحمہ اللہ</sup> -এর নিকট তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্বীয় উস্তাদগণ হতে রিওয়ায়েত ও ফতোয়া দানের সনদ প্রাপ্তির পর ফতোয়ার আসনে সমাসীন হন।

**অধ্যাপনা:** সতের বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। মসজিদে নববী ছিল তাঁর পাঠদানের জায়গা। বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর দরবারে এসে জড়ো হতো।

**শিক্ষকবৃন্দ:** ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহু আলায়হ অসংখ্য জ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। উল্লিখিত শিক্ষকগণ ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য আরো কতিপয় শিক্ষক হলেন: ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে হরমূয রহমতুল্লাহু আলায়হ, ২. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৩. শায়খ আবু যুবাইর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৪. শায়খ আবু আবদুল্লাহ জাফর আস সাদিক রহমতুল্লাহু আলায়হ প্রমুখ।

**ছাত্রবৃন্দ:** হযরত মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহু আলায়হ দীর্ঘকাল মসজিদে নববীতে শিক্ষার মজলিস পরিচালনা করেন। মদীনা নগরী তথা দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করার স্পৃহা নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হত। তিনি এ সকল অনুরাগী শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের আলো দান করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে কতিপয় হলেন: ১. হযরত আবু তাম্মা আবদুল আযীয ইবনে আবু হাশিম রহমতুল্লাহু আলায়হ, ২. হযরত ওসমান ইবনে ঈসা ইবনে কানানা রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৩. হযরত মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান আল-মাখযুমী রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৫. ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহু আলায়হ, ৭. ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হ প্রমুখ।

**ব্যক্তিগত গুণাবলি:** ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহু আলায়হ একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফিকহ বিশারদ ও মুজতাহিদ ছিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, আমার এরূপ রজনী যায়নি, যে রজনীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, ‘ইমাম মালিক ইবনে আনাস না থাকলে হিজ্যবাসীদের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত। হাদীসের পাঠদানে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হ খুবই আগ্রহবোধ করতেন এবং এটাকে তিনি ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে পাঠদান করতেন। পাঠদানের প্রারম্ভে গোসল করা, পরিস্কার জামা-কাপড় পরিধান করা ও খুশবু ব্যবহার ইত্যাদি ছিল তাঁর নৈমিত্তিক অভ্যাস। তিনি সুদীর্ঘ ৫০ বছর কাল শিক্ষা ও ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে তিনি মদীনায় পাদুকা ব্যবহার করতেন না এবং বাহনে চড়তেন না। তিনি বলতেন, যে যমীনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন, সে যমীনে আমি বাহনে চড়া লজ্জাবোধ করি।

**নির্যাতন ভোগ:** খলীফা মানসূর হিজরী ১৪৫ সন মুতাবিক ৭৬২ খিস্টাব্দে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মদীনার শাসক হলে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হ-এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন যে, খলিফা মানসুরের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়, কেননা এ আনুগত্য জোরপূর্বক নেয়া হয়েছিল। এ ফতোয়ার ফলে অনেকে মুহাম্মদ রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর দলে যোগদান করে। উক্ত বিদ্রোহ বার্থ হয়ে গেলে তিনি মদীনার গভর্নর

জাফর ইবনে সুলায়মান কর্তৃক বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। এ আঘাতের কারণে তাঁর কাঁধের একটি অংশ স্থানচ্যুত হয়।

**ফিকহের ইতিহাসে ইমাম মালিক** আবু হান্নিফা আলিয়াহ-এর স্থান: ফিকহের ইতিহাসে ইমাম মালিক আবু হান্নিফা আলিয়াহ-এর স্থান অতি উর্ধ্বে। কেননা তিনি ফিকহের ক্রম বিকাশের এমন এক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেন যখন কিয়াস ব্যাপক এবং অত্যাবশ্যক ছিল না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সময় সময় কিয়াসের আশ্রয় নেয়া হত এবং যখন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের চিন্তাধারা আইন বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেনি। স্থানের বিবেচনায় তিনি মদীনায় প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনার ফসল হিসেবে ইমাম আবু হানিফা আবু হান্নিফা আলিয়াহ রচিত শাস্ত্রের আলোকে হাদীসগ্রন্থ মুয়াত্তা রচনা করেন। যা তাঁকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান দিয়েছে।

**রচনাবলি:** ইমাম মালিক ইবনে আনাস আবু হান্নিফা আলিয়াহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো, ১. تَفْسِيرُ غَرِيبِ الْقُرْآنِ, ২. كِتَابُ الْمُجَاسَاتِ عَنْ, ৩. رِسَالَةُ مَالِكٍ إِلَى ابْنِ وَهَّابٍ, ৪. رِسَالَةُ مَالِكٍ فِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, ৫. كِتَابُ, ৬. أَحْكَامُ الْقُرْآنِ, ৭. أَلْمَدُونَةُ الْكُبْرَى, ৮. كِتَابُ الْمَسَائِلِ وَأَجْوَابِهَا, ৯. أَلْمَوْطَأُ, ১০. رِسَالَةُ مَالِكٍ إِلَى ابْنِ مَطْرَفٍ, ১১. كِتَابُ الْأَنْظِيَةِ, ১২. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ, ১৩. السِّيَرُ ইত্যাদি।

**ইত্তিকাল:** তিনি ১৭৯ হিজরীর ১১/১৪ রবিউল আউয়াল (৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন) বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ মতান্তরে ৮৬/৮৭/৯০ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

### ৩. শাফিয়ী মাযহাব

শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সাহেবের নামের শেষে উদ্ধৃত ‘আশ-শাফিয়ী’ শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম করা হয় ‘শাফিয়ী মাযহাব’। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

**পরিচিতি:** নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, মাতার নাম উম্মুল হাসান। নিসবতী নাম শাফিয়ী, পিতার নাম ইদরিস, তাঁর পূর্বপুরুষ শাফিয়ী-এর নামানুসারে তিনি শাফিয়ী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

**বংশধারা:** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফিয়ী ইবনে সাযিব আল-কারশী আল-হাশিমী। তাঁর পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশের আর মাতা ছিলেন আযদ বংশের।

**জন্ম:** তিনি ১৫০ হিজরী মুতাবিক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তানের আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, যেদিন ইমাম

আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি ইস্তিকাল করেন সে দিনই ইমাম শাফিয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি জন্মগ্রহণ করেন।

**বাল্যকাল:** দু'বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা ইস্তিকাল করেন। ফলে তাঁর মাতাই তাঁকে লালন-পালন করেন। বাল্যকালে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে গমন করেন। অতপর পবিত্র ভূমিতেই তাঁর বাল্যকাল অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত হয়। বাল্যকালে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হতে প্রাচীন আরবী কবিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করেন।

**শিক্ষাজীবন:** সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্ত করেন। অতপর মক্কা শরীফের বিশিষ্ট জ্ঞান পণ্ডিত মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী রাহমতুল্লাহি আলায়হি ও সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর নিকট ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়সে তাঁর ওস্তাদ তাঁকে ফতোয়া দানের অনুমতি দেন, তবে তিনি ওস্তাদের সার্টিফিকেট নিয়ে ইমাম মালিক রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি তাঁকে মুয়াত্তা শোনান এবং তাঁর নিকট ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। হিজরী ১৭৯ মুতাবিক ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইমাম মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর নিকট অবস্থান করেন।

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, মিশর ইত্যাদি দেশ সফর করেন। ইরাকে গিয়ে তিনি ইমাম মুহাম্মদ রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি মালিকী ও হানাফী মাযহাবের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করে ত্রিমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং মক্কায় আগত মিশরী, স্পেনীয় ও আফ্রিকান আলিমের সাথেও ভাবের আদান-প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

**অধ্যাপনা:** শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনার কাজে মনোবিবেশ করেন। অতপর তিনি প্রথমে ইরাক গমন করেন। সেখানকার আলিমগণ তাঁর নিকট হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

তিনি হানাফী ও মালিকী মুহাদ্দিসগণের মাযহাব মিলিয়ে মধ্যপন্থী এক মাযহাব তথা শাফিয়ী মাযহাব প্রবর্তন করেন। তিনি সে মতে গ্রন্থ রচনা করেন, লোকদেরকে শিক্ষা দেন এবং এ মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেন। তাঁর এ মাযহাবকে কাদীম বা পুরাতন মাযহাব বলা হয়। মিশরে গমন করার পর তাঁর ইরাকী ফিকহের কিছু পরিবর্তন করে নতুন মিসরী ফিকহ প্রবর্তন করেন এবং এ মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ মাযহাবকে ‘মাযহাবে জাদীদ’ বা নতুন মাযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফিয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি নিজেই তাঁর মাযহাব প্রচার করেন। তাঁর ছাত্রগণও লেখনীর মাধ্যমে দলে দলে প্রচারকার্যে যোগদান করেন। ফলে বিভিন্ন দেশে তাঁর মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে তাঁর মাযহাব সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে।



রচনাবলি: তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো: ১. الرَّسَالَةُ فِي أُدْلَةٍ ২. الْأَحْكَامُ ৩. كِتَابُ الْأُمِّ ৪. إِيْتْيَادِي ইত্যাদি।

**গভর্নরের দায়িত্ব পালন:** আব্বাসীয় সম্রাট হারুন-উর-রশীদের খিলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে, তাঁর বিরুদ্ধে হিজরী ১৮৪ সনে সম্রাটের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ফযল ইবনে রবী-এর সুপারিশক্রমে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বপদে বহাল থাকেন। কিছুকাল চাকরি করার পর তিনি ফিকহশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইরাক চলে যান।

**গুণাবলি:** ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ একজন শীর্ষস্থানীয় ফিকহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমাহার ছিল। তিনিই উসূলে ফিকহশাস্ত্রের প্রথম সংকলক। তিনি এ প্রসঙ্গে আর-রিসালা নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

মিফতাহুস সাআদার গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ সমগ্র বিশ্বের ইমাম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে এরূপ জ্ঞান ও গর্ব একত্রিত করেছেন যা তাঁর পরে কোন ইমামের মধ্যে একত্রিত করেন নি।” তিনি আরবী কাব্যেও সুদক্ষ ছিলেন। কিতাবে উশ্মে যুহাইর, ইমরুল কাইস, জারীর প্রভৃতির কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ভাষাবিশারদ আল-আসমায়ী তাঁর নিকট হতে বনু হুযাইলের কবিতা ও শানফারার দিওয়ান শ্রবণ করেছেন। যাকারানী মোহতাজ আলিয়াহ বলেন, হাদীস বিশারদগণ ঘুমিয়ে ছিলেন, ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ তাদেরকে জাগিয়েছিল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মোহতাজ আলিয়াহ বলেন, এরূপ কোন জ্ঞানী নেই, যার প্রতি ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ-এর অবদান নেই। কারবেসী বলেন, আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার জ্ঞান ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ থেকেই লাভ করেছি, আমি তাঁর থেকে জ্ঞানী এবং তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।” ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ ছিলেন সর্ব বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার জন্যে ইরাকবাসীগণ তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা ‘হাদীসের সহায়ক’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুহাম্মদ ইবনে হাকীম বলেন, ইমাম সাহেবের মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, তাঁর গর্ভ হতে ‘মুশতরী’ তারকা বের হয়ে উহা বিচূর্ণ হয়ে বিভিন্ন শহরে নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন একজন বুয়ুর্গকে স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বললেন, তোমার গর্ভ হতে এমন এক যবরদস্ত আলিম জন্মগ্রহণ করবে, যার ইলম সর্বস্থানে বিস্তার লাভ করবে। ইমাম শাফিয়ী মোহতাজ আলিয়াহ বলেন, একদিন আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে কাছে ডেকে পরিচয় জানতে চাইলেন, আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, “আমি আপনার বংশের সন্তান।” তখন তিনি আমাকে তাঁর

কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি স্বীয় থুথু নিয়ে আমার ঠোঁটে, মুখে লাগিয়ে বললেন, যাও! আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন।

**শিক্ষকবৃন্দ:** তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী রাহিমুল্লাহ, আবদুল আযীয ইবনে মাজেশুন রাহিমুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহিমুল্লাহ, মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী রাহিমুল্লাহ, সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রাহিমুল্লাহ প্রমুখ।

**ছাত্রবৃন্দ:** তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমুল্লাহ হাসান ইবনে মুহাম্মদ রাহিমুল্লাহ, ইবরাহীম ইবনে খালিদ রাহিমুল্লাহ, আবদুল হুসাইন ইবনে আলী আল-কারাবিসী রাহিমুল্লাহ, আবু সূলায়মান দাউদ ইবনে আলী রাহিমুল্লাহ, আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া রাহিমুল্লাহ, আবু ওসমান ইবনে সাঈদ রাহিমুল্লাহ, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর রাহিমুল্লাহ, ইবনে জরীর তাবায়ী রাহিমুল্লাহ, ইবনে কাইস রাহিমুল্লাহ, ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া রাহিমুল্লাহ, আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া রাহিমুল্লাহ, রবী ইবনে সূলায়মান রাহিমুল্লাহ, হুরমুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়া রাহিমুল্লাহ প্রমুখ।

**ইত্তিকাল:** তিনি হিজরী ২০৪ সনের রযব মাসের শেষ দিন মূতাবিক ৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মিশরের ফুসতাতে ইত্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। জুমাবার আসরের পর তাঁকে মিশরের ফুসতাতে সমাহিত করা হয়।

## ৪. হাম্বলী মাযহাব

এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমুল্লাহ। তাঁর দাদার নামানুসারে মাযহাবের নাম করা হয় ‘হাম্বলী মাযহাব।’ নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

**পরিচিতি:** তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি শাইখুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ, বংশগত পরিচয় শায়বানী। পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম হাম্বল।

**বংশধারা:** হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ ইবনে ইদরিস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে আওফ ইবনে কাসিত ইবনে মাযিন ইবনে শায়বান। বংশগতভাবে তিনি আরবী।

**জন্মগ্রহণ:** তিনি হিজরী ১৬৪ সালের রবিউল আউয়াল মাস মূতাবেক ৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

**বাল্যকাল:** তাঁর ৩ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। তখন তাঁর মাতা ইয়াতিম বালক আহমদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। মাতার তত্ত্বাবধানে

তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর মাতাই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

**শিক্ষাজীবন:** তিনি স্বীয় মাতার তত্ত্বাবধানে প্রথমে কুরআন মজীদ হিফয করেন। সাত বছর বয়স থেকে তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে বাগদাদ নগরী ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী। এ নগরী তখন বহু জ্ঞানী, গুণী, ফকীহ ও হাদীসশাস্ত্রবিদের পদচারণায় মুখরিত ছিল। ফলে দীনী জ্ঞান লাভ করা তার জন্যে খুবই সহজ ছিল। স্থানীয় বড় বড় আলিমদের নিকট নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভের পর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামন, কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

**শিক্ষকবৃন্দ:** তিনি অসংখ্য প্রথিতযশা আলিমদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, ১. ইমাম ওয়াকী ইবনে যরারাহ, ২. ইমাম আবু ইউসুফ, ৩. ইমাম বিশর ইবনে মুফাসসাল, ৪. ইমাম মু'তামিম ইবনে সুলায়মান, ৫. ইমাম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, ৬. শায়খ আব্বাদ ইবনে আব্বাদ রাহিমাহুল্লাহ, ৭. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়দা, ৮. ইমাম ইবরাহীম ইবনে সাদ আলসালী রাহিমাহুল্লাহ ও ৯. ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ।

**ছাত্রবৃন্দ:** অগণিত জ্ঞানপিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধগণ হলেন: ১. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, ২. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ, ৩. আবু বকর আল-আসলাম রাহিমাহুল্লাহ, ৪. আল-কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ, ৫. আবদুল মালেক আল-মায়মুনী রাহিমাহুল্লাহ, ৬. আবু যুরআ আদ-দিমশকী রাহিমাহুল্লাহ, ৭. বাকী ইবনে মুখাল্লাদ রাহিমাহুল্লাহ, ৮. শাহীন ইবনুস সামীদ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ফিকহ অত্যন্ত সহজ ও সরল। তা মূলত আহলে হাদীসের এমন একটি পন্থা যাতে দিরায়াত, বিচার-বুদ্ধি ও তর্ক-বিতর্কের খুব কমই সাহায্য নেয়া হয়েছে।

**স্মৃতিশক্তি:** তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহু ছাত্র তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ‘তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি মাত্র চার বছর বয়সে কুরআন মজীদ হিফয করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য ইমাম আবু যুরআ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমার শায়খগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে বড় হাফিযে হাদীস আর কেউ নেই’।

**গুণাবলি:** তিনি একাধারে ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, খোদাভীর পরহেযগার; যুক্তাকী এবং বড় আবিদ। দীনের প্রতি ছিল পূর্ণ বিশ্বাস। সত্যের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি ছিলেন একজন দাতা ও অতিশয় বুদ্ধিমান। এককথায় তিনি ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি দিনে ও রাতে একশত পঞ্চাশ থেকে তিনশত রাকাত পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন। তিনি ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বাকি রাত নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করে কাটিয়ে দিতেন। তিনি খলিফা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাহচর্য লাভ করতে পছন্দ করতেন না। তিনি দরিদ্রদেরকে অকাতরে দান করতেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। পার্শ্বি লোভ-লালসার প্রতি তাঁর মোটেও আত্মা ছিল না।

নির্যাতনের শিকার: দীনের হিফায়তের জন্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহ খলীফা মামূনের উত্তরসূরী কর্তৃক অনেক যাতনা সহ্য করেছেন। কুরআন জদীন না কদীম (নশ্বর কি অবিনশ্বর) এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে তিনি চাবুকের আঘাত খেয়েছেন এবং জেল খেটেছেন।

পরবর্তীতে খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। খলিফা তাঁকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান ও সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর পরিবারকে একটি বৃত্তিও প্রদান করেন।

রচনাবলি: তিনি জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রসিদ্ধ কতিপয় হলো: ১. مُسْنَدُ، ২. أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ৩. كِتَابُ التَّفْسِيرِ، ৪. كِتَابُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ، ৫. كِتَابُ طَاعَةِ اللَّهِ، ৬. كِتَابُ الْإِيمَانِ، ৭. كِتَابُ الْمَسَائِلِ، ৮. كِتَابُ الْفَرَائِضِ، ৯. كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ ১০. ইত্যাদি।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহ ছিলেন একজন সুদক্ষ হাদীস বিশারদ। হাদীসের দোষ-গুণ বিচার শক্তি, বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি ছিল তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর হাদীস সংকলনের প্রচেষ্টা ছিল শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুতকল্পে তিনি অকল্পনীয় পরিশ্রম করেন। এ মর্মে তিনি প্রথমে বিভিন্ন সূত্রে সাড়ে সাত লক্ষাধিক হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেন। অতঃপর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করে একটি হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। যা মুসনদে আহমদ নামে সুপরিচিত। এ গ্রন্থের হাদীস নির্বাচনে তিনি প্রথমত বর্ণনাকারীরা গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি দেন। এক্ষেত্রে যেসব বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা তথা নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত নয়, তিনি তাদের সমুদয় বর্ণনা বর্জন করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সহীহ হাদীস চয়নের প্রতি। সহীহ হাদীসের সাথে যাতে কোনক্রমেই যয়ীফ, মওযু ইত্যাদি হাদীস সংমিশ্রিত না হয় এ ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। হাদীসের বিশ্বস্ততা নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। হাদীসের বিশ্বস্ততা নির্ধারণে তিনি কোন শাইখ বা প্রখ্যাত আলিম দ্বারা প্রভাবিত হননি।

তাঁর গ্রন্থটি ১৭২ খণ্ডে বিভক্ত, এর সর্বমোট হাদীস ৩০ হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, এর হাদীস সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক। শাহ আব্দুল আযীয বলেন, এ গ্রন্থে ইমাম আহমদ কর্তৃক সন্নিবেশিত হাদীস সংখ্যা ৩০ হাজার। বাকি ১০ হাজারেরও অধিক হাদীস তাঁরই সুযোগ্য পুত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ কর্তৃক সংযোজিত। এতে মুসনাদের প্রচলিত রচনা-রীতি অনুসরণ পূর্বক সাহাবীদের নামভিত্তিক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

**তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি:** তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন প্রশংসা মূলক উক্তি করেছেন। যেমন—

১. ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি একদিন বাগদাদ থেকে বের হয়েছি। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে মুত্তাকী, পরহেযগার, বড় ফিকহবিদ এবং বড় আলিম প্রত্যক্ষ করিনি।’
২. হযরত ইয়াহিয়া ইবনে মাসীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইমাম আহমদ একরূপ গুণের অধিকারী ছিলেন, যেসব গুণ আমি কখনো কারো মধ্যে দেখিনি; তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, হাফিযে হাদীস, শীর্ষস্থানীয় আলিম, পরহেযগার দুনিয়া বিমুখ এবং বিবেকবান।’
৩. হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন ‘তিনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে হুজ্জত (দলীল) ছিলেন।’
৪. হযরত আলী ইবনে মাদীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ ইসলামের যে মর্যাদায় অবস্থান করেছেন, সে মর্যাদায় কেউ অবস্থান করতে পারেনি।’

**ইত্তিকাল:** তিনি ২৪১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইত্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে, লোকের সমাগম দেখে তিন হাজার ইহুদী ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাঁর দাফনের ২৩০ বছর পর তাঁর কবরের পার্শ্বে আরেকটি কবর খনন করতে গিয়ে তাঁর লাশ অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ তাঁরা সকলের ওপর রহম করুন। আমীন।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আত-তাবরীযী : আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (০০০-৭৪১ হি. = ০০০-১৩৪০ খ্রি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)
৩. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-নাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.):  
(ক) *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)  
(খ) *আল-মু'জামুল সগীর*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
৪. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর* = *আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)
৫. আদ-দারাকুতনী : শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আস-সুনান*, মুআস্সিসাতুর রিসালা,

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬. আন-নাসাফী

: আবুল বারাকাত, হাফিযুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (০০০-৭১০ হি. = ০০০-১৩১০ খ্রি.), *মনারুল আনওয়ার ফী উসুলিল ফিকহ*, মতবায়ে আহমদ কামিল, কায়রো, মিসর (১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.)

৭. আন-নাসায়ী

: আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আয-যু'আফা ওয়াল মতরুকুন*, দারুল ওয়া'যী আল-আরবী, হলব, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

৮. আন-নাওয়াওয়া

: আবু যাকারিয়া, মুহুউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৯. আবদুল কাদির আল-কুরাশী: আবু মুহাম্মদ, মুহুউদ্দীন, আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নসরুল্লাহ আল-কুরাশী (৬৯৬-৭৭৫ হি. = ১২৯৭-১৩৭৩ খ্রি.), *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানিফা*, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

১০. আবুল হাসান আল-আমাদী: আবুল হাসান, সাইয়েদুদ্দীন আলী ইবনে আবু আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিম আস-সা'লাবী আল-আমাদী (৫৫১-৬৩১ হি. = ১১৫৬-১২৩৩ খ্রি.), *আল-ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান ও দামিশক, সিরিয়া

১১. আবু দাউদ

: আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশির আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান*,

আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২১  
হি. = ২০০০ খ্রি.)

১২. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী: আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারুদ  
আত-তায়ালিসী (১৩৩-২০৪ হি. = ৭৫০-৮১৯ খ্রি.),  
আল-মুসনদ, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

১৩. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ  
ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে  
মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. =  
৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), মুসনদু ইমাম আবী হানিফা,  
মাকতাবাতুল কওসার, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৪. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-  
যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি.  
= ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.):

(ক) তায়কিরাতুল হুফায = তাবকাতুল হুফায,  
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

(খ) মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল, দারুল  
মা'রিফা লিত-তাবা'আ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান  
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

(গ) মুনাকিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহিবায়হি,  
লাজনাতে ইয়াহইয়ায়ি মাআরিফ আন-নু'মানিয়া  
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

(ঘ) সিয়াকু আলামিন নুবালা, মুআসসাসা তুর  
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫  
হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

১৫. আর-রামাহুরমুযী : আবু মুহাম্মদ, কাযী, আল-হাসান ইবনে আবদুর  
রহমান ইবনে খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী আল-ফারসী  
(০০০-৩৬০ হি. = ০০০-৯৭০ খ্রি.), আল-মুহাদ্দিসুল  
ফাসিল বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী, দারুল ফিকর,  
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. =  
১৯৮৩ খ্রি.)



১৬. আল-খতীবুল বগদাদী: আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.), তারীখে বগদাদ, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১৭. আল-জাস্‌সাস : আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্‌সাস (৩০৫-৩৭০ হি. = ৯১৭-৯৮০ খ্রি.), আহকামুল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৮. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.):

(ক) দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(খ) শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

১৯. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু 'আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনি ইবরাহীম ইবনিল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উম্মিরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারুল তওকিন নাজাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২০. আল-মারগীনানী : বুরহানুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল আল-ফিরগানী আল-মারগানানী (৫৩০-৫৯৩ হি. = ১১৩৫-১১৯৭ খ্রি.), আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

২১. আল-মুনযিরী : আবু মুহাম্মদ, যকীউদ্দীন, আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কওরী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুনযিরী

(৫৮১-৬৫৬ হি. = ১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), *আতরগীব ওয়াত তারহীব*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

২২. আল-মুওয়াফ্ফাকুল মক্কী: আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারযিমী (৪৮৪-৫৬৮ হি. = ১০৯১-১১৭৬ খ্রি.), *মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা*, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩১১ হি. = ১৮৯৩ খ্রি.)

২৩. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

২৪. আস-সুবকী : তাজুদ্দীন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি. = ১৩২৭-১৩৭০ খ্রি.), *তাবাকাতুস শাফিয়া আল-কুবরা*, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

২৫. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.):

(ক) *আল-হাওয়া লিল-ফতওয়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

(খ) *তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিব আবী হানিফা*, দারুল ওয়া'য়ী আল-আরবী, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.)

২৬. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

২৭. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বর আন-নামারী আল-কুরতুবী

(৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), *জামিউ বয়ানিল ইলম ওয়া ফযলিহি*, দারু ইবনিল জাওয়ী, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৮. ইবনে খল্লিকান

: আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮-৬৮১ হি. = ১২১১-১২৮২ খ্রি.), *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আশ্বাউ আবনাযিয় যামান*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

২৯. ইবনে জরীর আত-তাবারী: আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি. = ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৩০. ইবনু খুযায়মা

: শায়খুল ইসলাম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালিহ ইবনে বকর আস-সুলামী আন-নায়সাপুরী আশ-শাফিয়ী (২২৩-৩১১ হি. = ৮৩৮-৯২৩ খ্রি.), *আস-সহীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান

৩১. ইবনে তায়মিয়া

: শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দামিশকী (৬৬১-৭২৮ হি. = ১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), *আল-মুসাওয়াদা ফী উসূলিল ফিকহ*, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

৩২. ইবনে ফাহদ

: তকী উদ্দীন, আবুল ফযল, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাশিমী আল-আলওয়ী আল-আসফুনী আল-মক্কী আশ-শাফিয়ী (৭৮৭-৮৭১ হি. = ১৩৮৫-১৪৬৬ খ্রি.), *লাহযুল আলহায বি-যায়লি তাবাকাতিল হুফফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯৮ খ্রি.)

৩৩. ইবনে মাজাহ

: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. =

৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব  
আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩৪. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে  
সা'দ আল-জাওযিয়া (৬৯১-৭৫১ হি. = ১২৯২-১৩৫০  
খ্রি.), ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন,  
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম  
সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৩৫. ইবনে আমীর হাজ: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে মুহাম্মদ = ইবনে আমীর হাজ = ইবনুল  
মওয়াক্কিত আল-হানাফী (৮২৫-৮৭৯ হি. =  
১৪২২-১৪৭৪ খ্রি.), আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর,  
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান  
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ২০৮৩ খ্রি.)

৩৬. ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী: আবু মুহাম্মদ, মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন, আবদুল্লাহ  
ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-  
জামায়ীলী আল-মাকদিসী আল-দামিশকী আল-  
হানবলী (৫৪১-৬২০ হি. = ১১৪৭-১২২৩ খ্রি.),  
রওয়াতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মানাযির, দারুল  
রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত,  
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২  
খ্রি.)

৩৭. ইবনে খসরু : আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে খসরু আল-বলখী (১০০০-৫২২ হি. =  
১০০০-১১২৭ খ্রি.), মুসনদুল ইমাম আল-আ'যম  
আবী হানিফা, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, মক্কা  
মুকাররমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি.  
= ২০১০ খ্রি.)

৩৮. ইবনুল হাজ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনুল হাজ আল-আবদরী (১০০০-৭৩৭ হি. =  
১০০০-১৩৩৬ খ্রি.), মদখালুশ শর'ই আশ-শরীফ, দারুত  
তুরাস, বয়রুত, লেবনান

৩৯. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী  
(৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.):

(ক) তাহযীবুত তাহযীব, দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.)

(খ) লিসানুল মীযান, মুআস্সাতুল আ'লামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

৪০. ইবনে হিব্বান

: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.), আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৪১. কাযী যাকারিয়া

: কাযিউল কুযাত, শায়খুল ইসলাম, যয়নুদ্দীন, আবু ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে যাকারিয়া আল-আনসারী আল-খায়রাজী আস-সুনাযকী আল-মিরসী আশ-শাফিয়ী (৮২৪-৯২৬ হি. = ১৪২০-১৫১৯ খ্রি.), গায়াতুল উসূল ফী শরহি লুবিলা উসূল, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়া, কায়রো, মিসর

৪২. আল-গাযালী

: হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তুসী (৪৫০-৫০৫ হি. = ১০৫৮-১১১১ খ্রি.), আল-মুস্তাফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)


৪৩. তাশ কুবরাযাদাহ

: উসামুদ্দীন, আবুল খায়র, আহমদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে খলীল (৯০১-৯৬৮ হি. = ১৪৯৫-১৫৬১ খ্রি.), মিস্তাহ্‌স সা'আদা ওয়া মিসবাহ্‌ সিয়াদা, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩২৮ হি. = ১৯০৯ খ্রি.)

৪৪. ফখরুদ্দীন আর-রাযী:

ফখরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি. = ১১৫০-১২১০ খ্রি.), মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৪৫. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৪৬. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহ আল-মুখতাসার বি-নাকলিল আদল আনিল আদল ইলা রাসূলিল্লাহ*  = *আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৪৭. আয-যারকাশী : বদরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বাহাদুর ইবনে আবদুল্লাহ আয-যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪ হি. = ১৩৪৪-১৩৯২ খ্রি.), দারুল কুতুবী (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪৮. সিদ্দীক হাসান খান: আবুল তাইয়িব, মুহাম্মদ সিদ্দীক খান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিনুজী (১২৪৮-১৩০৭ হি. = ১৮৩২-১৮৯০ খ্রি.):  
(ক) *আত-তাজুল মুকাম্মাল মিন জাওয়াহিরি মাআসিরিত তারাযিল আখির ওয়াল আওয়াল*, ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনুল ইসলামিয়া, কাতার (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.)

(খ) *ফতহুল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন*, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৪৯. আশ-শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শওকানী আল-ইয়ামানী (১১৭৩-১২৫০ হি. = ১৭৫৯-১৮৩৪ খ্রি.), *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল*, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)